ক্রুসেড-১৬

টার্গেট ফিলিস্তিন

আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ১৬

টার্গেট ফিলিস্তিন

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৩১৩৬০

ক্রুসেড - ১৬

টার্গেট ফিলিস্তিন

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৩১৩৬০

পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী ২০১২
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০২
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-16
Turget Filistin
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, 01717431360
5th Edition: February 2012
Published on: September 2002

PRICE : 50.00 TAKA

ISBN 984-581-207-4

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত ▼ রিচার্ডের নৌবহর ▼ **মহাসমর**

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

উমরু দরবেশ, আশী ও দুই কমাণ্ডো পাহাড়ী অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছে। তারা যাচ্ছে সুদানের রাজধানী খার্তুমের দিকে। তখনো তীব্র গতিতে ছুটছে তাদের ঘোড়া। উমরু দরবেশ ঘোড়ার গতি না কমিয়ে সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই সহযাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমাদের খুব জলদি সেখানে পৌঁছতে হবে। আশী! তুমি ক্লান্তি বোধ করলে আমার পিছনে এসে বসতে পারো! কারণ অল্প সময়ে আমি দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিতে চাই! ওদের কোন গোয়েন্দা আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে যাক, তা আমি চাই না। এমন কিছু ঘটে গেলে তার যে খেসারত দিতে হবে, তা আমি সইতে পারবো না।'

উমরু দরবেশেরে এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সুদানের এক গোয়েন্দা তখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল সুদানের রাজধানী খার্তুমের দিকে। চোখের সামনে সঙ্গীদের সবাইকে ধরা পড়ে যেতে দেখে জনতার ভীড় থেকে এই গোয়েন্দা এক পা, এক পা করে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা টের পেয়ে তাকে ধাওয়া করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের ধোঁকা দিয়ে কৌশলে সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

যখন সে বুঝতে পারলো, ধাওয়াকারীদের এ যাত্রা খসাতে পেরেছে, তখনি তার মনে চিন্তা জাগলো, ওরা জানে আমি

খার্তুম যাবো। সাবধান করবো সুদান সরকারকে। ফলে খার্তুম পৌঁছার আগ পর্যন্ত ওরা আমাকে ধাওয়া করবে। এ কথা মনে হতেই সে খার্তুমের পথ ছেড়ে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল ঘোড়ার মুখ। উদ্দেশ্য, ধাওয়াকারীদের চোখে ধূলো দিয়ে ঘুর পথে খার্তুমের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

অনেক পথ ঘুরে খার্তুমের পথ ধরায় সে যে উমরু দরবেশের দল থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে এ তথ্য তার জানা ছিল না। জানা ছিল না, ভিন্ন এক মিশন নিয়ে আশী এবং উমরু দরবেশও ছুটে চলেছে খার্তুমের পথে।

ছুটে চলেছে সুদানী গোয়েন্দা। সঙ্গীবিহীন একাকী পথ চলছে সে। মনের ভেতর তোলপাড় করছে কত কথা! গতকাল উমরু দরবেশের অভিনয় দেখে ভাবছিল, মিশন শুধু সফলই নয়, আশাতীত সাফল্যের খবর দিতে পারবে সে সুদানী সরকারকে। বলবে, শুধু পাহাড়ী অঞ্চল নয়, সারা দেশেই উমরু দরবেশের এ ভেলকিবাজী দেখানো উচিত। অথচ কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে এখন সে খার্তুমই যাচ্ছে, কিন্তু সাফল্যের পরিবর্তে তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে নিজেদের শোচনীয় ব্যর্থতার খবর। তাদের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে এ সংবাদ সে কোন্ মুখে শোনাবে সরকারকে! এ সংবাদ পেয়ে সরকার বাহাদুর কেমন ব্যবহার করবে তার সাথে!

পথ চলছে সুদানী গোয়েন্দা। তার সব ক্ষোভ ও রাগ গিয়ে পড়লো আশীর ওপর। নিশ্চয়ই এ বিপর্যয়ের পেছনে উমরু

দরবেশের ষড়যন্ত্র ও ইন্ধন রয়েছে। উমরু দরবেশকে বিশ্বাস করা যায় না বলেই তো আশীকে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ মেয়ে কি এতই আনাড়ী যে, সে এ ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পেলো না! নাকি আশী নিজেও জড়িয়ে পড়েছে এ ষড়যন্ত্রের সাথে! সে সিদ্ধান্ত নিল, উমরু দরবেশ এবং আশীর ব্যাপারে তার সন্দেহের কথাও সে সরকারকে জানাবে।

একই ঘটনার জের ধরে খার্তুম ছুটে যাচ্ছে দুই ভিন্ন কাফেলা। একদল ভাবছে, সেনাপতিকে মিথ্যা সংবাদ জানিয়ে ইসহাককে তারা মুক্ত করবে, পারলে সুদানের কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনবে তাদের সহযোগী বন্ধুদের। অন্যজন ভাবছে, একবার খার্তুম পৌঁছে নেই, উমরু দরবেশ ও আশীকে কারাগারের ভাত না খাইয়ে ছাড়ছি না এবার।

আল্লাহর জ্যোতির রহস্য দেখার অদম্য আগ্রহ মানুষের চোখেমুখে খেলা করছিল। আলী বিন সুফিয়ানের পেছন পেছন দল বেঁধে মশালের আলোতে পাহাড় চূড়ায় উঠছিল লোকগুলো। আলী বিন সুফিয়ানের সাথে তাঁর কমাণ্ডো এবং সেই ইমাম সাহেবও ছিলেন, যিনি উমরু দরবেশের কাহিনী শুনিয়েছিলেন তাঁকে।

পাহাড়ের চূড়ায় আলীর কমাণ্ডোরা দুই গোয়েন্দাকে বেঁধে অপেক্ষা করছিল। মশাল নিয়ে লোকজনকে উপরে আসতে দেখলো তারা। এক কমাণ্ডো নিজের হাতের মশাল উঁচু করে ধরলো, যাতে লোকেরা তাদের দেখতে পায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ধৃত দুই গোয়েন্দা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। প্রথমে ভেবেছিল, তারা ভূতের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু লোকজনকে পাহাড়ে চড়তে দেখেই হুশ হলো তাদের। একজন আলীর কমাণ্ডোদের বললো, 'আমাদের সাথে চলো। তোমরা যা চাবে তাই দেব। দয়া করে আমাদের ছেড়ে দাও।'

'তোমরা কি সব মুসলমানকেই গাদ্দার মনে করো? চাইলেই যে কারো ঈমান কিনে নেয়া যায়, দুনিয়া এতই সহজ!' উত্তরে বললো এক কমাণ্ডো।

'দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও দোজখের আগুনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তোমরা নিজের জাতিকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলে। প্রতারণার জাল বিছিয়ে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছিলে নিজের ভাই-বেরাদর ও কওমকে। আগে এর বদলা উশুল করি, তারপর তোমাদের আবেদন বিবেচনা করা যাবে।' বললো অপর কমাণ্ডো।

'ঐ যে, ওরা আসছে!' এক গোয়েন্দা ভয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'লোকজন আমাদেরকে হাতের নাগালে পেলে পাথর মেরেই হত্যা করে ফেলবে। আমাদের ওপর রহম করো। মৃত্যু বড় কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। আমাদের বাঁচাও, বিনিময়ে তোমরা যা চাও তাই দেবো। বলো তো,, সারা জনম গোলাম হয়ে থাকবো তোমাদের, তবু আমাদের বাঁচাও! আমাদের কাছে অনেক সোনা-দানা আছে, আমাদেরকে ওপাশ দিয়ে নিচে নিয়ে চলো, সব তোমাদের দিয়ে দেবো।'

মশাল যত উপরে উঠছিল, দুই বন্দীর আতংক ও অস্থিরতা

ততই বেড়ে যাচ্ছিল। বন্দীদের সব অনুনয় বিনয় বিফলে গেলে শেষে একজন বললো, 'তাহলে অন্তত এটুকু দয়া করো, তোমাদের কাছে তলোয়ার আছে, সেই তলোয়ার দিয়ে আমাদের গর্দান উড়িয়ে দাও, তবু আমাদেরকে জনতার আক্রোশ থেকে বাঁচাও।'

'জনতার আক্রোশ থেকে নয়, আল্লাহর আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করো। যে পাপ ও অপরাধ তোমরা করেছো, আল্লাহ তোমাদের কি কঠিন শাস্তি দেবেন, সেই চিন্তা করো আগে।'

মশাল নিয়ে জনতা তাদের কাছে এসে থামলো। আলী বিন সুফিয়ান কমাণ্ডোদের এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাতে জনতা ওদেরকে হাতের নাগালের মধ্যে না পায়। লোকজন ওদের চার পাশ ঘিরে দাঁড়ালো। বন্দী দু'জন দুই হাটুর ফাঁকে এমনভাবে মুখ লুকালো, যেন কেউ ওদের মুখ দেখতে না পায়। ভীড় বেশী দেখে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'হাত ধরাধরি করে সবাই আরো পেছনে সরে যাও, ঘেরাও আরো বড় করো, যাতে সবাই দেখতে পারে।'

কমাণ্ডোরা জনতার ভীড়কে আরো পেছনে ঠেলে দিল। এরপর এক কমাণ্ডার হাতের মশাল বন্দীদের সামনে দুই পাথরের ফাঁকে আটকে দিয়ে এসে দাঁড়াল দুই বন্দীর পেছনে। দুই হাতে মাথার চুল ধরে ঝটকা টানে জনতার সামনে উন্মুক্ত করে দিল তাদের চেহারা। জনগণ লোক দু'জনকে দেখে খুবই বিস্মিত হলো, কারণ তারা দু'জনই এ এলাকার লোক।

'এই সে তুরের তাজাল্লি দেখানোর লোক।' আলী বিন সুফিয়ান লোকদের বুঝিয়ে বললেন, 'এরা কিভাবে সেই জ্যোতি তৈরী করতো এখন নিজেরাই তা তোমাদের করে দেখাবে।'

তাঁর ইশারায় কমাণ্ডোরা দুই বন্দীকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। বললো, 'জনতার আক্রোশ থেকে বাঁচতে চাইলে যা বলছি জলদি করো। নইলে তোমাদেরকে জনতার হাতে ছেড়ে দিতে আমরা বাধ্য হবো। আর যদি আমাদের কথা মত কাজ করো, তাহলে তাদের আক্রোশ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো আমরা।'

ওরা পাথরের ওপর ওদের ঢেলে দেয়া পেট্রোলের দিকে তাকালো। এখনো তা শুকিয়ে যায়নি। কাছেই পড়ে আছে সেই পাত্রটি, যেটিতে রাখা ছিল সেই তেল।

তাদের একজন এগিয়ে সেই তেলের ওপর মশাল ছোঁয়াতেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন।

আলী বিন সুফিয়ান পাত্রটি হাতে নিয়ে বললেন, 'এই পাত্রে সেই জ্বালানি তেল ভর্তি ছিল, যে তেল আমি আগে কাপড়ে ঢেলে দেখিয়েছি। সেই তেল এখানে ঢেলে দেয়া হয়েছে। আমি আমার চারজন লোককে সন্ধ্যার আগেই এখানে গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারা এখানে এসে লুকিয়ে থাকায় উমরু দরবেশের এ লোকেরা ওদের দেখতে পায়নি। গতকালের মতই এরা অপেক্ষা করছিল, কখন উমরু দরবেশ মশাল উঁচিয়ে ইশারা করবে। উমরু দরবেশের ইশারা পেলেই

এরা পাথরের ওপর ঢেলে রাখা এই তেলে আগুন ধরিয়ে দিত। আর তোমরা সেই আলোকে তুরের তাজাল্লি মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যেতে। কিন্তু আজ আমার লোকেরা আগুন লাগানোর আগেই এদের বেঁধে ফেলায় উমরু দরবেশ বার বার মশাল নাড়ার পরও পাহাড়ের চূড়ায় তোমরা কোন আলো দেখতে পাওনি।'

'এরা ছিল তিনজন।' এক কমাণ্ডো বললো, 'এদের অন্য একজন আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসে নিহত হয়, তার লাশ গাছের নিছে পড়ে আছে।'

আলী বিন সুফিয়ানের ইশারায় নিহত লোকের লাশও সেখানে টেনে নিয়ে এলো কমাণ্ডোরা। আলী বিন সুফিয়ান ধৃত গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা এ জনপদের মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার মিশন নিয়ে সুদানের কাফের সরকারের পক্ষ থেকে এখানে কাজ করছিলে, এ কথা অস্বীকার করতে পারবে? বলো, আমি কি মিথ্যা বলছি?'

'আমাকে ক্ষমা করুন!' একজন ভীত কম্পিত স্বরে বললো, 'আপনি যা বলেছেন তা বিলকুল সত্যি।'

'তোমরা কি এ এলাকার মুসলমান নও?'

'হ্যাঁ!' দু'জনই মাথা নত করে সম্মতি জানালো।

'খৃস্টান ও সুদানী কাফেররা কি তোমাদেরকে এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়নি?'

'হ্যাঁ, তারাই দিয়েছে!'

'আর তোমরা তোমাদের জাতিকে ধোঁকা দিয়ে এবং নিজের

ধর্মকে ধ্বংস করে তাদের কাছ থেকে ভাতা ও পুরস্কার নাও?'
'হ্যাঁ। আমরা এর বিনিময়ে পুরস্কার ও ভাতা পেয়ে থাকি।'
একজন উত্তর দিল, 'তবে আজ থেকে তওবা করছি, জীবনে আর কখনো এমনটি করবো না। আপনি দয়া করে এবারের মত আমাদের ক্ষমা করে দিন।'
অপর জন বললো, 'আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা ওয়াদা করছি, এরপর থেকে জাতির জন্য, ধর্মের জন্য আমরা আমাদের জীবনকে বিলিয়ে দেবো।'
এ সময় অকস্মাৎ এক ব্যক্তি জনতার ভিতর থেকে ছুটে এসে তলোয়ারের আঘাতে দুই বেঈমানের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিৎকার করে উঠল, 'বেঈমান, এখনো ভণ্ডামী!' তারপর তলোয়ার আলীর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললো, 'যদি আমি অপরাধী হয়ে থাকি, যদি সবার কাছে আমি খুনী হয়ে থাকি, তবে এ তলোয়ার দিয়েই আমাকে হত্যা করা হোক।'
গাদ্দারদের মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, আলীর পায়ের কাছে পড়ে ছিল লোকটির রক্তাক্ত তলোয়ার, আলী তাকালেন ইমাম সাহেবের দিকে।
ইমাম সাহেব ভরাট ও দরাজ কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহর কসম, এ লোক খুনী নয়। এই হত্যা শরিয়তে জায়েজ!'
আলী বিন সুফিয়ান এবার উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখনও কি কারো মনে কোন প্রকার সন্দেহ আছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার নাম করে এরা তোমাদের ঈমানকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছিল?'

সমস্বরে সবাই বললো, 'না। আল্লাহর হাজার শোকর যে, আপনি সময় মত এসে আমাদেরকে গোমরাহীর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।'

ভোর রাত। এক স্থানে ঘোড়া থামালেন উমরু দরবেশ। আশী এবং কমাণ্ডোদের বললো, 'খানিক বিশ্রাম নিয়ে নাও। ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওদেরও একটু বিশ্রাম প্রয়োজন।'
রাজধানীর পথে ছুটে চলা সুদানী গোয়েন্দা মধ্য রাত পর্যন্ত একটানা পথ চললো। শেষে ঘুম আর ক্লান্তির কাছে পরাজিত হয়ে এক জায়গায় থেমে গেল বিশ্রামের জন্য। তাবু টানিয়ে শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লো সে। এ গোয়েন্দার তো আর জানা ছিল না, উমরু দরবেশ তার আগেই সদলবলে যাত্রা করেছে রাজধানী খার্তুমের দিকে। জানা থাকলে এমন বিশ্রামের কথা হয়তো সে চিন্তাও করতো না।
ফজরের নামাজ পর্যন্ত বিশ্রাম নিল উমরু দরবেশের দল। সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই কাফেলা নিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। উমরু দরবেশ ছিলেন একজন জাত সৈনিক। কমাণ্ডোরাও তাই। ফলে দুর্গম পথের কষ্ট সহ্য করা তাদের জন্য নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু আশী মেয়ে মানুষ। তার ওপর নবীন বয়স। প্রতিপালিত হয়েছে শাহী মহলের আদর সোহাগ ও বিলাসিতায়। যদিও কষ্ট সহ্যের ট্রেনিং ছিল কিন্তু তা কেবল ট্রেনিং পর্যন্তই, কোন দিন তার মুখোমুখি হতে হয়নি।
বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে কাফেলা। রোদের উত্তাপ গায়ে

এসে কামড় বসাতে শুরু করেছে, আশীর দিকে তাকালেন উমরু দরবেশ। তার চেহারায় রাত জাগার ক্লান্তি, মুখটা মলিন। মেয়েটির এ বিমর্ষ রূপ দেখে মায়া হলো উমরু দরবেশের। বললো, 'আশী! তোমার সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

'এমন পরিস্থিতিতে কখনো পড়িনি তো!' আশীর সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তাছাড়া, তোমার তো রাত জাগার অভ্যাস নেই, তাই দু'চোখে লেগে আছে ক্লান্তি ও ঘুমের ঘোর। এক কাজ করো, তুমি চলে এসো আমার ঘোড়ার পিঠে, তাতে কষ্ট একটু লাঘব হবে।' আশী একটু হাসলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

একটু পর। আশীর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘুমিয়ে পড়লে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে পারে। উমরু দরবেশ আবারও বললো, 'আশী! তোমার ঘোড়া ছেড়ে চলে আসো। আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখো, তাহলে পড়বে না ঘোড়া থেকে।' আশী এবারও হাসলো, ম্লান হাসি। কিন্তু ঘোড়া থামালো না। অশ্ব ছুটে চলেছে। কিছু দূর গিয়ে এক কমাণ্ডো উমরু দরবেশকে বললো, 'মেয়েটা তো পড়ে যাবে!'

উমরু দরবেশ নিজের ঘোড়া নিয়ে গেলেন আশীর ঘোড়ার পাশে এবং লাগাম টেনে ধরে থামিয়ে দিলেন তার ঘোড়া। আশী জেগে উঠলো। উমরু দরবেশ বললো, 'আমার সামনে এসে বসো।'

'আমি কারো সাহায্য চাই না।' আশী বললো, 'আমিই বরং সাহায্য করবো তোমাদের। আমাকে আমার অঙ্গীকার পূরণ করতে দাও। আমার মা-বাবার হত্যা ও আমার মান-সম্ভ্রম নষ্টের প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে। আমি জেগে থাকার চেষ্টা করছি।'

ঘোড়া আবার চলতে লাগলো। কিছু দূর গিয়ে এক সময় আশী ঠিকই ঘুমিয়ে পড়লো। উমরু দরবেশ পাশেই ছিলেন, নইলে মাটিতে পড়ে যেত আশী।

তিনি ঘোড়া থামিয়ে আশীকে কিছু না বলেই তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের ঘোড়ার সামনে বসিয়ে দিলেন। এক কমাণ্ডো তার ঘোড়ায় জ্বীনের সাথে আশীর ঘোড়া বেঁধে নিল। আবার যাত্রা করলো কাফেলা।

ঘোড়া ছুটছে পূর্ণ গতিতে। আশী এবার আর ঘুমকে তাড়াতে চেষ্টা করলো না। সে মাথাটি আস্তে করে উমরু দরবেশের বুকে ঠেকিয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লো।

আশীর খোলা চুল উমরু দরবেশের চোখে মুখে আঘাত হানছিল। দেহ ও চুলের ঘ্রাণ আছড়ে পড়ছিল তার নাসারন্ধ্রে। কিন্তু এমন চুল ও দেহের পরশ তাঁর মনের উপরে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, যেমন এক যুবতী ও যুবকের মনে প্রভাব ও ক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁর মনে আশীর সেই কথাগুলো বাজতে লাগলো, 'তোমার কোলে বসে আমার ছোট বেলায় বাবার কোলে বসার আনন্দ ও নিরাপত্তার কথা মনে পড়ছে। আজ যেমন তুমি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আগলে

রেখেছিলে, সেদিনও আমার বাবা আমাকে এমনিভাবে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে রেখেছিল।'

আশী কিছুদিন আগে যখন এ পথে পাহাড়ী অঞ্চলে যাচ্ছিল তখন মরুভূমিতে রাতে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে ভয়ে উমরু দরবেশের বুকে লাফিয়ে পড়ে এ কথা বলেছিল। উমরু দরবেশের মনে এখন সে কথাগুলোই নীরবে বার বার ভেসে উঠছিল। উমরু দরবেশের মনে হলো, সে তাকে আরো বলছে, 'উমরু দরবেশ! আমি মুসলমানের মেয়ে, আমাকে আর খৃষ্টানদের হাতে তুলে দিও না। আমার চোখের সামনে রক্ত! রক্ত! রক্ত! সে রক্ত আমার বাবার! সে রক্ত আমার মায়ের! বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র মাটিতে মিশে আছে সে রক্ত। উমরু দরবেশ! তোমার শিরাতে কি হাশেম দরবেশের রক্ত বইছে না? তাহলে তোমাকে সে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে, যে রক্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের মাটি একদিন চুষে নিয়েছিল আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। তোমাকে ফিলিস্তিনের সম্মান ও সম্ভ্রম ডেকে বলছে, 'হে আল্লাহর বান্দা! হে আখেরী নবীর খোশ-নবীব উম্মত! তোমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসকে মন থেকে মুছে ফেলো না! জীবন তো কল্যাণের পথে ব্যয় করার জন্যই! সেই প্রথম কেবলাকে নাপাক দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করো। ওরে হাশিম দরবেশের বেটা! এ কাজে তুমি যদি এগিয়ে না যাও তবে মরেও যে তুমি শান্তি পাবে না!'

উমরু দরবেশের ঘোড়ার গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে

লাগলো। কমাণ্ডোরাও গতি বাড়ালো তাদের ঘোড়ার। বাতাসের বেগে ছুটছে ঘোড়াগুলো! এক কমাণ্ডো তার ঘোড়া নিয়ে গেল উমরু দরবেশের কাছে। বললো, 'উমরু দরবেশ! সামনে কোন ফাঁড়ি থেকে ঘোড়া বদলানোর যদি সুযোগ থাকে তবে কিছু বলতে চাই না। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে ঘোড়াগুলোকে এভাবে শেষ করা উচিৎ হবে না! বলি কি! দয়া করে একটু আস্তে চালান!'
উমরু দরবেশ কমাণ্ডোর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ঘোড়ার গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনলেন। বললো, 'আল্লাহ জাল্লে শানুহু আমাদের সঙ্গে আছেন। ঘোড়া ক্লান্ত হবে না।'
তাদের কথার শব্দ এবং গতিতে ছন্দপতন ঘটায় আশীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম!'
'ভালই ঘুমিয়েছো।' উমরু দরবেশ বললো, 'আরো ঘুমুবে?'
'না, আর কোন ঘুমের প্রয়োজন নেই আমার। তোমার স্পর্শ আবার আমার মনে নতুন করে ঈমানী জোশ পয়দা করে দিয়েছে। এখন আমি আগের চাইতেও তীব্র গতিতে ছুটতে পারবো।'
'তাহলে যাও! নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করো। ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যা নাগাদ আমরা পৌছে যেতে পারবো।'

আলী বিন সুফিয়ান সেই গ্রামে গেলেন, যে গ্রামে উমরু দরবেশ প্রথম রাতে কেরামতি দেখিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছিল। তিনি তার কমাণ্ডো বাহিনীকে দায়িত্ব দিলেন, তারা

যেন সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং উমরু দরবেশের ভিলকিভাজীর মুখোশ উন্মোচন করে আসল তথ্য জনগণকে অবহিত করে। গোয়েন্দা বাহিনী গ্রামের সাধারণ মানুষের পোশাকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং উমরু দরবেশের ভণ্ডামী ধরা পড়ার কাহিনী লোকজনকে বলে বেড়াতে লাগলো। ইমাম সাহেব তার মুসল্লীদের সামনে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে উজ্জীবিত করে তোললেন মুসল্লীদের। তিনি বললেন, 'সুদানীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তোমাদের প্রস্তুত ও সতর্ক থাকতে হবে। সামরিক অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ওরা এখানকার মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। আমাদের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। আমরা এ পাহাড়ী অঞ্চলকে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য মনে করি। এখানে দীর্ঘকাল ধরে যে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শাসন চালু আছে তাই বহাল থাকবে। যদি এখানে নতুন করে কোন গাদ্দার ও গোয়েন্দা পয়দা হয়, তাহলে তাদের করুণ ও দুঃখজনক পরিণতির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।'

আলী বিন সুফিয়ান বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এ অঞ্চলে পা দিয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে এবং তাঁর বিচক্ষণ ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে অল্পতেই এ ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটিত হয়েছে। আলী বিন সুফিয়ান এবার তার কমাণ্ডো বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন।

সুদানের কারাগার থেকে মুক্ত করে ইসহাককে একটি সুন্দর বাড়ীতে রাখা হয়েছিল। তাঁকে সেখানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হতো। তার সেবাযত্নের জন্য ছিল পর্যাপ্ত দাসদাসী। লোকজন তাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করতো। নির্যাতন তো দূরের কথা, কেউ আর নতুন কোন প্রস্তাব নিয়ে এসে তাকে বিরক্তও করতো না। তিনি ভাল করেই বুঝলেন, কেন তার সাথে এমন ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে। উমরু দরবেশ তাহলে তার মিশন নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে! মনে মনে বেশ স্বস্তি অনুভব করলেন তিনি।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর ইসহাক তার কামরায় একাকী বসেছিলেন। ভাবছিলেন উমরু দরবেশের কথা। সে এখন কি করছে? সেকি ফাঁকি দিতে পেরেছে সুদানীদের? নাকি ওদের হাত থেকে মুক্ত হতে গিয়ে নতুন করে বিপদে জড়িয়ে পড়েছে? তাঁর গোপন ইচ্ছা ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর ভাগ্যে কি ঘটবে মনে হতেই শিউরে উঠলেন তিনি।

ইসহাক এখন কি করবেন সে কথাই চিন্তা করছিলেন। তিনি তাঁর সামনে দু'টি নতুন বিপদ দেখতে পেয়ে আঁৎকে উঠলেন। প্রথমত: উমরু দরবেশ কারাগারের কঠিন শাস্তির ভয়ে সুদানীদের খেলনায় পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়ত: উমরু দরবেশ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ধরা পড়তে পারে ওদের হাতে। দুই অবস্থাতেই ইসহাকের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। উমরু দরবেশের কথা ভাবতে গিয়ে এ আশংকা মনে উদয় হতেই এক ধরনের ভয়, শিহরণ

ও ব্যস্ততা অনুভব করলেন তিনি। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন। শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, উমরু দরবেশের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। যা করার তার নিজেকেই করতে হবে। ইসহাক নিজস্ব পরিকল্পনায় পালানোর কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কিভাবে পালাবেন তার কোন পথ খুঁজে পেলেন না।

সুদানীদের জন্য তিনি এক মূল্যবান কয়েদী! সে জন্য সুদান সরকার তার ওপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে। উমরু দরবেশ তাঁর কাছ থেকে পৃথক হওয়ার সময় বলেছিল, সুদানী মুসলমানদেরকে সুদান সরকারের অনুগত বানানোর প্রস্তাবে রাজি হলে সরকার তাকে মুক্ত করে দেবে। তাহলে উমরু দরবেশ কি এখন মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার কাজ করে যাচ্ছে! ইসহাক জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিল। ভাবছিল, এ জাহান্নাম থেকে মুক্তির তবে কি কোন পথ নেই?

সূর্য অস্ত গিয়েছে খানিক আগে। চারজন অশ্বারোহী সুদানের রাজধানী খার্তুমে প্রবেশ করলো। ডানে বায়ে না তাকিয়ে ওরা সোজা সামরিক হেডকোয়ার্টারে গিয়ে থামলো। উমরু দরবেশ জানেন, কোথায় যেতে হবে ও কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাকে নতুন চিন্তাধারার ট্রেনিং এখানেই দেয়া হয়েছিল। রক্ষীদের কাছে পৌঁছেই উমরু দরবেশ বললো, 'জলদি আমাকে সেনাপতির কাছে পৌঁছে দাও।'

রক্ষী কমাণ্ডার দ্রুত তাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল।

'ব্যর্থ হয়ে ফিরেছ নাকি সফল হয়েছ?' উমরু দরবেশকে

দেখতে পেয়েই সেনাপতি প্রশ্ন করলো।
'ভাল সংবাদ এর কাছেই শোনো!' উমরু দরবেশ আশীর দিকে ইশারা করে বললো, 'হয়তো আমার কথা তোমার বিশ্বাস নাও হতে পারে।'
ক্লান্তি ও অবসাদে কামরায় প্রবেশ করেই আশী পালংকের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লো। উমরু দরবেশের কথা শুনে মদির কটাক্ষ হেনে তৃপ্তির হাসি হেসে বললো, 'ভনিতা রাখো তো দরবেশ! সব কিছু দ্রুত খুলে বলো। এখনো অনেক কাজ বাকী আছে, জলদি করো। কারণ আমাদের হাতে সময় বেশী নেই।'
'আমাদের মিশন এত তাড়াতাড়ি সফল হবে, এমন আশা আমাদের মোটেই ছিল না।' উমরু দরবেশ বললেন। তিনি কিভাবে কি করেছেন সব খুলে বললেন। কেমন করে ভেজা কাপড়ে আগুন ধরালেন, কেমন করে তুরের তাজাল্লি দেখালেন, সব।
'আর তাঁর কথা বলার সময় সম্মোহনের যে আবেগ তৈরী হতো, সবকিছু জানা না থাকলে আমিও তো মজে যেতাম!' আশী উমরু দরবেশের কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে অভিভূত কণ্ঠে বললো, 'লোকেরা তাঁর কথা মুগ্ধ বিস্ময়ে গিলতো। মনে হতো, লোকগুলোর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, সবকিছু নিস্প্রাণ, নির্জীব। কেবল প্রাণময় সত্তা উমরু দরবেশ। সে যদি রহীমকে বলতো, তোমার নাম রাম, লোকগুলো হয়তো তাই বিশ্বাস করতো।'

‘কেন, কেউ কি এ পর্যন্ত আপনাকে আমাদের সাফল্যের সংবাদ দেয়নি?’ উমরু দরবেশ প্রশ্ন করলেন।
‘না! কেউ আসেনি!’ সুদানী সেনাপতি বললো, ‘আমি তো তোমাদের নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের মিশনের খবর শোনার জন্য।’
উমরু দরবেশ এ কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হলেন। যাক, এখনও সে গোয়েন্দা এসে পৌঁছেনি, যে আলীর গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দিয়ে জনতার মধ্য থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। উমরু দরবেশ সেনাপতির কথা বিশ্বাস করলো। কারণ সে গোয়েন্দা জানতো না উমরু দরবেশ খার্তুমের পথ ধরেছে। ফলে তার চলার গতিতে সেই আবেগ ও শঙ্কা কাজ করেনি, যে ভয় তাড়িত করেছে উমরু দরবেশদের। সমান গতিতে আসলেও তার এসে পৌঁছতে সময় লাগার কথা। কারণ তাড়া খেয়ে সে নিশ্চয়ই সোজা পথে আসবে না। ঘুর পথে আসতে গেলে সময় তো একটু বেশী লাগবেই।
উমরু দরবেশ সুদানী গোয়েন্দার আগমন বিলম্বে খুশী হলো। সবাইকে বোকা বানিয়ে ইসহাককে নিয়ে সরে পড়ার এটাই সুযোগ। ওই গোয়েন্দা এসে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আসল ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবে। তখন উমরু দরবেশের ভাগ্যে আগের মত আর কারাগারের জীবনও জুটবে না। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন শাস্তিই বরাদ্দ করে না এমন অপরাধীর জন্য।
‘এখন আমার ইসহাকের প্রয়োজন।’ কোন রকম ভূমিকা

ছাড়াই উমরু দরবেশ বললো, 'আমি সেখানকার মুসলমানের মগজ ধোলাই করেছি। আমি তাদের সুদান সরকারের অনুগত হতেও রাজী করাতে পেরেছি। আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তাদের মনে ঘৃণা ও শত্রুতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। তাদের অন্তরে আমি এ ধারনা বদ্ধমূল করতে পেরেছি যে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ফেরাউনের উত্তরসুরী। এখন প্রয়োজন সুদানের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য তাদেরকে ডাক দেয়া। এ ডাক কেবল সেই দিতে পারে, যে সেখানকার মুসলমানের আস্থাভাজন ও বিশ্বাসী নেতা। যদি তেমন কাউকে দিয়ে একবার সেখানকার মুসলমানদের এ আহবান জানাতে পারেন, আমার বিশ্বাস, সে এলাকা পুরোপুরি আপনাদের করায়ত্বে এসে যাবে। আমি জানি এবং যাচাই করেও দেখেছি, তাদের একমাত্র বিশ্বস্ত নেতা ইসহাক। সে ছাড়া আর এমন কেউ নেই, যার ডাকে তারা বিনা প্রশ্নে সাড়া দেবে।'

'কিন্তু ইসহাককে কে বোঝাবে?' সুদানী সেনাপতি বললো, 'আমি তো তাকে সে এলাকার আমীর করার লোভও দেখিয়েছি। তাকে এমন কঠিন কঠিন শাস্তি দিয়েছি, যে শাস্তি ঘোড়াও সহ্য করতে পারে না। আশীকে পাঠিয়েছিলাম তাকে বশ করতে, সেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।'

'এখন আমাকে চেষ্টা করতে দিন।' উমরু দরবেশ বললো, 'তাকে কারাগার থেকে বের করে সেই কামরাতে আনুন, যেখানে আপনি তাকে এবং আমাকে একদিন রেখেছিলেন।

আপনি তার শত্রু, কিন্তু আমি তার সঙ্গী এবং বন্ধু।'
'তুমি কি আশীকে দিয়ে আরেকবার চেষ্টা করবে?' সুদানী সেনাপতি বললো।
'না!' উমরু দরবেশ বললো, 'এখন আমি আমার কথার যাদুতে তাকে বাধ্য করবো। আমি তার ওপর সেই সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করবো, যে বিদ্যার কারণে আমার বংশ দরবেশ বংশ হিসাবে পরিচিত। কেবল একটি রাত, আশা করি সূর্য উঠার আগেই সে আমার জালে বন্দী হবে। আমি বেশী সময় নিতে চাই না। সে এলাকায় আমার অনুপস্থিতি দীর্ঘ হলে তাদের ঘোর কেটে যেতে পারে। ঘোর কাটার আগেই আমি তাদের শোনাতে চাই সে আহ্বান, যে আহ্বান শোনানোর জন্য আপনারা এতকাল ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আপনি জানেন, সেখানে মিশরের গোয়েন্দা রয়েছে। আমি সেখানে যে যাদু চালিয়েছি সে যাদুর প্রভাব নষ্ট করার মত সুযোগ আমি মিশরী গোয়েন্দাদের দিতে চাই না।'
সুদানী সেনাপতি উমরু দরবেশের দুই সঙ্গী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উমরু দরবেশ বললো, 'এরা আমার দুই মুরীদ! এরা আমার এমন ভক্ত হয়ে গেছে যে, বাড়ীঘর ছেড়ে মরার আগ পর্যন্ত আমার খেদমতে থাকার জন্য স্বেচ্ছায় চলে এসেছে। ভেবে দেখলাম, কাজকর্ম করানোর জন্য দু'একজন লোক সঙ্গে থাকলে ভালই হয়। তাই ওদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছি।'

উমরু দরবেশের সেই কাঙ্খিত কামরায় নিয়ে আসা হলো ইসহাককে। সেনাপতি নিজে ইসহাকের সাথে দেখা করে বললো, 'আমি তোমাদের জাতীয় প্রেরণা ও বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। তোমার এক বন্ধু উমরু দরবেশ তোমার সাথে দেখা করতে চায়। আমি আশা করি, তোমাদের সাক্ষাৎ প্রীতিপ্রদ হবে।'

'আমাকে কারাগারের জঘন্য পরিবেশে রাখো, তারচে জঘন্য নরকের পরিবেশে রাখো অথবা তোমাদের মহলেই রাখো, অত্যাচার করো বা লোভ দেখাও, আমাকে আমার পথ থেকে এক চুলও সরাতে পারবে না।' ইসহাক বললো, 'তুমি আমাকে মৃত্যুকূপে নিয়ে যাও অথবা রাজপ্রাসাদে, আমি ঈমান বিক্রি করবো না। বন্ধুত্ব আর শত্রুতা সবই আমার কাছে সমান। সব কিছুর ওপর থাকবে আমার বিশ্বাস, আমার ঈমান।'

সুদানী সেনাপতি হেসে দিল, কামরায় প্রবেশ করলো উমরু দরবেশ। উমরু দরবেশকে দেখেই ইসহাক বলে উঠলো, 'তোমার চেহারাই বলে দিচ্ছে, তুমি এ কাফেরদের কাছে তোমার ঈমান বিক্রি করে দিয়েছো। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার চেহারা ও চোখ বলছে, তুমি খুব আরামেই আছো। আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাও?'

'আমি তোমার চেহারায় আমার মত মুক্তির আনন্দ ও চমক দেখতে চাই।' উমরু দরবেশ বললো, 'একটু আমাকে বলার সুযোগ দাও, কিছুক্ষণের জন্য তোমার মন, তোমার বুদ্ধি

আমার কাছে সঁপে দাও। ধৈর্য ও শান্ত মনে আমার কথা শোনো! তাতে তোমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে না। আমি তোমার ঈমান কিনতে আসিনি। ঈমান নিয়ে ব্যবসা আমি করি না। আমি তোমার বন্ধু, তোমার মঙ্গলাকাঙ্খী। কিসে তোমার কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ, কিসে মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল– এটুকুই শুধু আমি তোমার সাথে খোলাখুলি ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ করতে চাই।'

এ আলাপের সময় সুদানী সেনাপতি পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ইসহাক তাদের এক মূল্যবান কয়েদী। তার ব্যাপারে কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজী নয় সেনাপতি। উমরু দরবেশও একসময় কয়েদী ছিল। উমরু দরবেশ ধোঁকাও তো দিতে পারে! তাদের দু'জনকে এক কামরায় গোপন আলাপের সুযোগ দেয়া সমীচিন মনে হলো না সেনাপতির। তাই এ আলাপের সময় সে পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো।

এ আলাপের জায়গাটি কারাগার ছিল না। কিন্তু তাই বলে নিরাপত্তাহীনও ছিল না। চারজন পাহারাদার নিযুক্ত আছে এ বাড়ীতে। দু'জন প্রহরী সামনের ফটকে, অন্য দু'জন পিছনের সংকীর্ণ দরজায়। তাদের সাথে আছে বর্শা ও তলোয়ার। আরো আছে তীর ধনুক। ইচ্ছে করলেই কেউ পালিয়ে যেতে পারবে এমন নয়। উমরু দরবেশ ও ইসহাক এখান থেকে পালিয়ে যাবে এমন কোন ভয় বা আশঙ্কা ছিল না সেনাপতিরও।

উমরু দরবেশ চাচ্ছিলেন সেনাপতি সেখান থেকে চলে যাক,

কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না সেনাপতির হাবভাবে। তার উপস্থিতিতে উমরু দরবেশ ইসহাককে খোলাখুলি কিছু বলতেও পারছেন না, ওদিকে যে কোন সময় পাহাড়ী গোয়েন্দা এসে সবকিছু ফাঁস করে দিতে পারে! ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ডভাবে অস্থির হয়ে পড়লেন উমরু দরবেশ।

আশী গোসল ও বিশ্রামের জন্য পাশের কামরায় চলে গিয়েছিল। সে চলে এলে হয়তো সুদানী সেনাপতিকে সরানোর একটা কায়দা বের করতে পারতো। কিন্তু তার এদিকে আসার নামগন্ধও নেই। সুদানী সেনাপতি শিকড় গেড়ে বসে আছে এক আসনে। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে মূল্যবান কয়েকটি ঘন্টা। হয়তো সে গোয়েন্দা শহরের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে! সে এসে পড়লেই সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাবে।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। উমরু দরবেশের দুই সঙ্গী আলীর সেই কমাণ্ডো দু'জন বারান্দায় বসে উদ্বেগের সাথে তাকিয়েছিল উমরু দরবেশের দিকে। উদ্দেশ্য, তিনি কোন ইঙ্গিত বা ইশারা করলে যেন সাথে সাথে সে হুকুম তামিল করতে পারে।

কিছুক্ষণ পর। গোসল ও প্রসাধন সেরে বাইরে এলো আশী। তার সৌন্দর্য তখন ফুটে বের হচ্ছিল। সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে সেখানে খেলা করছিল প্রাণবন্ত সজীবতা। সে কমাণ্ডোদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'সেনাপতি কি চলে গেছে?' আশী জিজ্ঞেস করলো।
'না!' এক কমাণ্ডো উত্তর দিল, 'তিনি ভেতরেই আছেন।'
'তাকে তো সেখান থেকে সরানো দরকার!' আশী এই বলে সে কামরার দিকে পা বাড়াল।
উমরু দরবেশ আশীকে কামরায় প্রবেশ করতে দেখেলো। আশীকে দেখেই তার মনে আশার সঞ্চার হলো। সুদানী সেনাপতিও দেখলো তাকে, যেন বৃষ্টি ধোয়া গোলাপী-সাদায় মাখামাখি এক ফুটন্ত গোলাপ। চোখে তার রঙ লেগে গেল। আশীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। জবাবে আশীও প্রশ্রয়ের হাসি উপহার দিল তাকে। তারপর এগিয়ে সেনাপতির চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে চেয়ারের হাতলে ছড়িয়ে দিল তার ফর্সা হাত। সেনাপতি সেই হাতের দিকে তাকালো মুগ্ধ চোখে। আশীর প্রসাধনীর মাদকতাময় সৌরভ অনুভব করলো তার চারপাশে। আশী উমরু দরবেশের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করলো। উমরু দরবেশ সুযোগ পেয়ে ইঙ্গিতে সেনাপতিকে সরিয়ে নিতে বললেন আশীকে।
'ইসহাক ভাই!' উমরু দরবেশ প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কি সুদানের সন্তান নই?'
'আমরা সর্বপ্রথম ইসলামের সন্তান!' ইসহাক উত্তর দিলেন, 'আমি এখনও মিশরের সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক অনুগত সৈনিক। যদি সুদান আমার মা হয়, তবে আমি আমার মাকে ইসলামের শত্রুদের

হাতে তুলে দিতে পারি না।'

আশী পিছন থেকে সুদানী সেনাপতির কাঁধে আস্তে করে চাপ দিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই সুদানের সেনাপতির মন কি আমার দিক থেকে উঠে গেল!' হাসছিল আশী। সেনাপতি তৃষিত কণ্ঠে তার হাত ধরে বললো, 'আমার সাদা গোলাপ। আকাশে যতদিন চাঁদ থাকবে, ততদিন তোমার আকর্ষণ অম্লান থাকবে এ হৃদয়ে।'

'আমি এমন কঠিন ও কষ্টকর কাজ থেকে ফিরে এসেছি, আবারও সেই জংলীদের কাছে ফিরে যেতে হবে, যাদের কাছে পান করার পানি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কতদিন এক ঢোক শরাবও পান করার সুযোগ হয় না আমার!'

'ওহ হো! তাইতো সুন্দরী! আমি ওদের কথার জালে ব্যস্ত হয়ে তোমাকে তো ভুলেই গিয়েছিলাম! পাশের কামরায় যাও, আমি আসছি।'

'উঁ-হুঁ!' আশী বললো, 'আসছি মানে কি? আমি কি ওখানে একা একা বসে মাছি মারবো?'

সেনাপতি তাকালো ইসহাক ও উমরু দরবেশের দিকে। না, এখানে কোন ভয় বা সন্দেহের কিছু নেই। তাছাড়া দু'দিকেই আছে সশস্ত্র প্রহরী। ঠিক আছে, উমরু দরবেশ তার কথার যাদু চালিয়ে যাক, ক্ষতি কি!

আশী পুরুষ বশীভূত করার বিদ্যায় ওস্তাদ! শিশুকাল থেকেই পুরুষদের ফাঁসানোর প্রশিক্ষণ পেয়েছে সে। এ ফাঁদ কেটে

সেনাপতিই বা বেরিয়ে যাবে কেন? সুদানী সেনাপতি ধরা দিল ফাঁদে, তার মোহময় হাসিতে ভুলে তার পিছু পিছু চলে গেল পাশের কামরায়। সেখানে গিয়ে এক চাকরানীকে বললো, 'শরাব লাগাও।'

মদ ওই কামরাতেই ছিল, চাকরানী মদ ও মদের পাত্র ওদের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। আশী পিয়ালায় মদ ঢেলে সেনাপতির সামনে বাড়িয়ে বললো, 'খাও।'

আশীর পাল্লায় পড়ে পেয়ালার পর পেয়ালা শরাব পান করে চললো সেনাপতি।

'নিয়ত পরিষ্কার থাকলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করেন।' উমরু দরবেশ ইসহাককে বললো, 'আমি যা চিন্তা করেছিলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করেছে। সব কথা বলার সময় এখন নয়। আগে এ শহর থেকে বেরোই, তারপর সব কথা তোমাকে খুলে বলতে পারবো। দু'জন কমাণ্ডো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে সামনের ফটকে দু'জন এবং পিছনের দরজায় দু'জন, মোট চারজন প্রহরী আছে। সামনের ফটকে আমরা যাবো না। আমরা বেরোবো পেছনের দরজা দিয়ে। ফলে আমাদের শুধু পিছন দিকের দুই প্রহরীর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যে চারটি ঘোড়া নিয়ে এসেছি সেগুলো ওখানেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। প্রহরীদের চারটি ঘোড়াও সেখানে রাখা। তোমার জন্য সেখান থেকেই যে কোন একটা নিয়ে নিতে হবে। আমাদের এলাকায় মিশর থেকে কিছু লোক

এসেছে। তাদের নেতা অতিশয় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক। আমি তাঁর নাম জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তার নাম আমার কাছে প্রকাশ করতে রাজি হননি। তারাই পাহাড়ী অঞ্চলে প্রতি মুহূর্তে কি ঘটছে সে সংবাদ কায়রো পৌঁছে দিচ্ছে। তাদের সহায়তায় সেখানে সব সুদানী গুপ্তচরকে বন্দী করা হয়েছে। তিনিই তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার সঙ্গে দু'জন কমাণ্ডো পাঠিয়ে দিয়েছেন।' থামলেন উমরু দরবেশ। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, 'সেনাপতিকে সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি কোথায় গেল আমি একটু দেখে আসি! মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তুমি তৈরী হয়ে নাও।'

'কেন?' ইসহাক জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ বদ মেয়েটার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'বাইরে গিয়ে তোমাকে সব বলবো।' উমরু দরবেশ বললো, 'সে যেনতেন সম্পর্ক নয়! মেয়েটি মুসলমান!'

উমরু দরবেশ কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রহরীরা দেখেছে, সুদানী সেনাপতিও এ মেহমানকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করেন। সে জন্য তারাও তাকে বিপদজনক ব্যক্তি ভাবার পরিবর্তে সম্মানিত মেহমান হিসেবেই দেখছিল। এমন মেহমানকে অসন্তুষ্ট করে সেনাপতির বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি কে নেয়!

তিনি প্রথমে বারান্দায় বসা তার দুই সঙ্গীর কাছে গেলেন। তিনি তাদের বললো, 'এখুনি প্রহরীদের সামাল দিতে হবে।' তিনি আস্তে করে আশীর কামরার দরজায় ধাক্কা দিলেন।

দরজা নড়ে উঠলো, সেনাপতি নেশার ঘোরে জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'কে, কে ওখানে?'

'আমি দেখছি!' বললো আশী। সে উঠে এসে দরজা খুলে সামান্য একটু ফাঁক করে উমরু দরবেশকে দেখতে পেলো। চোখে চোখে কথা হলো ওদের। আশী দরজা বন্ধ করতে করতে বললো, 'কই, কেউ না তো! সম্ভবত বাতাসের ধাক্কায় দরজা নড়ে উঠেছিল।'

দরজা বন্ধ করে আশী আবার ফিরে এলো সেনাপতির কাছে। তাকে ধরে পালংকে শুইয়ে দিল। সেনাপতি বাহু বাড়িয়ে বললো, 'তুমিও আসো সুন্দরী! নেশায় নেশায় আমাকে পাগল করে দাও।'

'তুমি শোও, আমি একটু বাথরুম থেকে আসি।'

আশী ধীর পদে সরে এলো সেখান থেকে। আস্তে করে দরজা খুলে বাইরে চলে এলো এবং সন্তর্পনে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। উমরু দরবেশ আশী ও দুই কমাণ্ডোকে নিয়ে ইসহাকের কামরায় গেলেন। ততক্ষণে সেই সুদানী গোয়েন্দা শহরে চলে এসেছে। শহরে ঢুকেই গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারের পথ ধরলো সে লোক।

উমরু দরবেশ পেছন দরজার দুই প্রহরীকে ডাকলেন। বললো, 'ভেতরে যে কয়েদী আছে তাকে কারাগারে নিতে হবে। তোমরা জানো, তার সাথে কথা বলার জন্যই সেনাপতি আমাকে ডেকেছিলেন। কিন্তু এখানে কথা বলে সুবিধা হচ্ছে না, তাই সেনাপতি বলেছেন কয়েদীকে কারাগারে নিয়ে

যেতে। যাও, কয়েদীকে হাত বেঁধে নিয়ে এসো।'
দুই প্রহরী কয়েদীকে আনার জন্য পা বাড়ালো, তিনি বললো, 'দাঁড়াও! আমিও যাচ্ছি তোমাদের সাথে।'
ওরা তিনজন একত্রে ভেতরে প্রবেশ করলো। ওরা ইসহাকের কামরায় ঢুকার সাথে সাথে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একই সাথে দুই কমাণ্ডো দুই প্রহরীকে ঝাপটে ধরে তাদের বুকে মুহূর্তের মধ্যে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিল। কেন তাদেরকে মারা হলো সে কথা বুঝার আগেই দুই প্রহরী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। সুদানী গোয়েন্দা তখন গোয়েন্দা অফিসের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেছে। সে যখন সুদানী গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের সামনে বসে রিপোর্ট করছিল, উমরু দরবেশ তখন ইসহাককে বলছিলেন, 'ইসহাক! তাড়াতাড়ি! জলদি বের হও!'
ওরা বেরিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো। প্রধান ফটকের দুই প্রহরী তখনো জানে না, প্রাসাদের ভেতর কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে। জানে না, উমরু দরবেশ ও তাঁর সঙ্গীরা বন্দী ইসহাককে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের ফাঁকি দিয়ে। তারা নিশ্চিন্ত মনে ফটকে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিয়ে চললো।
ইসহাককে নিয়ে উমরু দরবেশ যখন ঘোড়ায় চড়ে বসলো, তখন অনেক রাত। শহরের পথঘাট সুনসান, ফাঁকা। নৈশ প্রহরী ছাড়া সবাই ডুবে আছে ঘুমের অতল তলে। পাঁচটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে চারজন পুরুষ ও একজন নারী। যত দ্রুত সম্ভব তারা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। ঘোড়ার

পিঠে চাবুক কষলো ওরা। সবার সামনে উমরু দরবেশ, তার পেছনে আশী, তার পেছনে ইসহাক এবং সবার পেছনে পাশাপাশি আলী বিন সুফিয়ানের অসম সাহসী জানবাজ দুই কমাণ্ডো। রাতের নিরবতা খান খান করে তীরবেগে ছুটে চললো ঘোড়া। নৈশ প্রহরীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই শহর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। কারা যায়, কোথায় যায়, এ কথা জানার আগেই মরুভূমির বিপুল বিস্তারে অন্ধকারে হারিয়ে গেল এ ছোট্ট দলটি। নৈশ প্রহরীরা জানতেও পারল না, সুদানী কারাগারের দুই মূল্যবান কয়েদী এবং সুদানী গোয়েন্দা বাহিনীর হীরার টুকরো এক মেয়েকে নিয়ে কেটে পড়েছে মিশরী দুই কমাণ্ডো।

পাহাড়ী গোয়েন্দার রিপোর্ট পেয়েই তাকে নিয়ে সেনাপতির কাছে ছুটলো গোয়েন্দা প্রধান। পথে বেরিয়েই তারা দেখতে পেলো, পাঁচটি ঘোড়া উর্ধশ্বাসে তাদের পাশ কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব দিকে খেয়াল দেয়ার মত মনমানসিকতা তখন ওদের ছিল না। ওদের মগজে কাজ করছিল একটাই চিন্তা, উমরু দরবেশের মিশন ব্যর্থ হয়েছে, এ খবর সেনাপতিকে পৌছাতে হবে। তারা সেনাপতির বাসায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, তিনি রাতে বাসায় ফেরেননি। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটলো সেনা অফিসে। ওখান থেকে জানতে পারলো, তিনি বেসামরিক এলাকায় সামরিক বাহিনীর গোপন আস্তানায় আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটলো সেখানে।

তারা সেখানে পৌছে সদর দরজায় করাঘাত করলো। পরিচয়

নিয়ে ফটক খুলে দিল পাহারারত প্রহরীদ্বয়। গোয়েন্দা প্রধান বললো, 'সেনাপতি এখন কোথায়?'
প্রহরীরা তাদেরকে সেই কামরা দেখিয়ে দিল, যেখানে তিনি আশীকে নিয়ে শরাবের আসর জমিয়েছিলেন। পাহাড়ী গোয়েন্দা ও গোয়েন্দা প্রধান ছুটে গেলো সেই কামরায়।
কামরায় মাতাল সেনাপতি তখন নেশার ঘোরে বেহুশ। তাকে ডাকা হলো, কিন্তু ঘুম ভাঙলো না তার। গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলা হলো, 'উঠুন, জরুরী খবর আছে!' কিন্তু তাতেও তার হুশ হলো না। শেষে তার নাকেমুখে পানির ছিটা দেয়া হলো। জড়িত কণ্ঠে তিনি বললো, 'কি ব্যাপার, এত রাতে বিরক্ত করছো কেন?'
গোয়েন্দা প্রধান বললো, 'গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। জলদি উঠুন!'
এবার ঘুম সম্পূর্ণ টুটে গেল সেনাপতির। তিনি সজাগ হয়েই বললো, 'উমরু দরবেশ ও তার সাথীরা কোথায়?'
'সে খবর নিয়েই আমি এসেছি।' বললো পাহাড়ী অঞ্চল থেকে আগত গোয়েন্দা।
'কি খবর নিয়ে এসেছো?'
'উমরু দরবেশের মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। মিশরের গোয়েন্দারা ধরে নিয়ে গেছে আশী, উমরু দরবেশ এবং আমাদের অন্যান্য সাথীদের। একজন নিহত হয়েছে ওদের হাতে।'
'কি আবোল তাবোল বকছো! আশী এবং উমরু দরবেশ তো এখন এখানেই আছে! তাদের মিশন সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। উমরু দরবেশ সেখানকার জনগণকে শেষ পর্যন্ত বোকা

বানাতে পেরেছে।'
এবার বিস্মিত হবার পালা গোয়েন্দার। সে অবাক হয়ে বললো, 'উমরু দরবেশ এবং আশী এখানে! সে কি করে হয়! আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমাদের সবাই ধরা পড়ে গেছে। আশী এবং উমরু দরবেশকে ঘিরে রেখেছে মিশরের একদল কমাণ্ডো বাহিনী!'
'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাশের কামরায় গিয়ে দেখো, উমরু দরবেশ ওখানেই আছে।'
ওরা দু'জন ছুটে গেল পাশের কামরায়। সেখানে আশী, উমরু দরবেশ, তার দুই ভক্ত, কয়েদী ইসহাক, ওরা কেউ নেই। তার বদলে সেখানে পড়ে আছে তাদেরই দুই প্রহরীর রক্তাক্ত লাশ।
গোয়েন্দা প্রধান কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলা। বিশ্বাসই করতে পারছিল না, চোখের সামনে পড়ে আছে মহলের দুই প্রহরীর লাশ। তখনো লাশ থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। কামরার মেঝে ভেসে গেছে সেই রক্তে। গোয়েন্দা প্রধান ছুটে কামরা থেকে বাইরে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকালো ফটকের দিকে। সেখানে দুই প্রহরী নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'এই উল্লুকের দল, জলদি এদিকে এসো।'
প্রহরীরা ছুটে এলো। গোয়েন্দা প্রধান ত্রস্ত পায়ে গিয়ে ঢুকলো সেনাপতির কামরায়। তার পেছনে পেছনে হতভম্ব সেই গোয়েন্দা। সেনাপতি তখনো মদের নেশা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, আচ্ছন্নের মত বসেছিল কামরায়। গোয়েন্দা

প্রধান বললো, ‘সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের দুই প্রহরীকে খুন করে পালিয়েছে বন্দীরা।’

‘কি বলছো তুমি!’ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো সেনাপতি, ‘ওরা ও ঘরে নেই?’

‘ওখানে আমার্দের দুই প্রহরীর লাশ পড়ে আছে। বন্দীরা উধাও।’

‘আশী! আশী কোথায়?’

‘তাকেও কোথাও দেখছি না।’

সেনাপতি ছুটে গেল সে কামরায়। তার পেছন পেছন গেল ফটকের প্রহরীরা। শোরগোল ও ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল মহলময়। ডাক-চিৎকারে জেগে উঠল মহলের চাকর-চাকরানী ও খাদেমরা। হৈ চৈ ও হট্টগোল শুনে মনে হচ্ছিল, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। মহল জুড়ে যখন এ হুলুস্থুল চলছিল, উমরু দরবেশ, ইসহাক, দুই কমাণ্ডো ও আশী তখন শহর থেকে অনেক দূরে। শিকারীর তাড়া খেয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত হরিনীর মত ওরা তখন ছুটছে সেই পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে, যেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন আলী বিন সুফিয়ান।

এক সময় কোলাহল কিছুটা কমলো। সেনাপতি গোয়েন্দা প্রধান ও পাহাড়ী অঞ্চল থেকে আগত গোয়েন্দাকে নিয়ে এক কামরায় বসলো আলোচনার জন্য। তার কাছ থেকে শুনলো উমরু দরবেশের তৎপরতার পূর্ণ বিবরণ। উমরু দরবেশ তাকে বোকা বানিয়েছে বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে উঠলো চোয়ালের মাংসপেশী। দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্ট কণ্ঠে সে কেবল উচ্চারণ করলো, ‘হুম।’

গোয়েন্দা প্রধান বললো, ‘এখনি ওদের পিছু ধাওয়া করা

দরকার!'

'রাখো তোমার পিছু ধাওয়া! এখান থেকে ওরা বেরিয়েছে এক-দেড় ঘন্টার আগে। তুমি কি মনে করো ওদের নাগাল পাওয়া এতই সোজা! আহাম্মক, ওরা এখন ছুটছে প্রাণের মায়ায়। যতই চেষ্টা করো কিছুতেই আর ওদের নাগাল পাবে না। ওদের পিছু ধাওয়া করার চিন্তা বাদ দিয়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে সেই চিন্তা করো। আশী এবং উমরু দরবেশের কাছে এমনসব তথ্য আছে, আমাদের সর্বনাশ করার জন্য যা যথেষ্ট। আমি ভাবছি, মিশরীয় গোয়েন্দা বাহিনী এসব তথ্য পেলে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে!'

পরদিন মধ্যরাতে উমরু দরবেশ সবাইকে নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করলেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তার আস্থা ছিল, মিশন যত জটিল ও দুঃসাহসিকই হোক না কেন, উমরু দরবেশ এ মিশনে সফল হবে। আলী বিন সুফিয়ান প্রথমে ভাবলেন, ইসহাককে নিয়ে ও ফিরে এলেই ওদের তিনি মিশরে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন, পাহাড়ী এলাকায় এরই মধ্যে যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে তার মোকাবেলায় এদের দু'জনকেই এ এলাকায় রেখে দেয়া প্রয়োজন। ওরা এলাকায় থাকলে এবং লোকদের সাথে মেলামেশা করলে মানুষ অন্তরে সাহস ও তৃপ্তি পাবে। সুদানীরা যে ধোঁকাবাজ এ কথা সবার মনে বদ্ধমূল করে দিতে পারলে ভবিষ্যতে ওরা নতুন কোন চাল চাললেও জনগণ সহজে তা বিশ্বাস করবে না। সুতরাং উমরু দরবেশের দল ওখানে এসে পৌঁছার সাথে সাথেই আলী বিন সুফিয়ান তাঁদের

দেখা শোনার জন্য কিছু লোককে নিযুক্ত করলেন। এরপর মিশর সেনাবাহিনীর কিছু চৌকস কমাণ্ডোকে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে দিলেন, যাতে ওরা সুদানীদের যে কোন তৎপরতার খবর দ্রুত সংগ্রহ করতে পারে। ওদের বললেন, 'যে কোন ধরনের খবর পাওয়ার সাথে সাথে তা কায়রো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে। আর ছোটখাট হামলা এলে তা মোকাবেলার জন্য কায়রোর সিদ্ধান্তের জন্য বসে থাকবে না। সুদানী বাহিনী আক্রমণ করলে গোপনে রাতে পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ওদেরকে এ এলাকা থেকে বিতাড়িত করে দেবে।'

আলী বিন সুফিয়ান সবাইকে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এক সন্ধ্যায় কায়রোর পথ ধরলেন। সঙ্গী হলো তার সাথে আসা অপর তিন কমাণ্ডো। চারজনের ছোট্ট কাফেলা যখন পথে নামলো তখন ওদের বিদায় জানানোর জন্য সেখানে জমায়েত হয়েছিল গ্রামের কয়েক হাজার লোক। লোকগুলোর চোখে মুখে তখন ঈমানের দীপ্তি জ্বলজ্বল করছিল। প্রতিটি হৃদয় আপনজন হারানোর বেদনায় বিধুর ছিল, চোখে ছিল উদগত অশ্রু।

আলী বিন সুফিয়ান 'খোদা হাফেজ' বলে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। দেখতে দেখতে আলী ও তাঁর সঙ্গীদের ঘোড়া দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। লোকগুলো বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো ওদের গমন পথের দিকে।

আলী বিন সুফিয়ান যখন সুদানী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে

পাহাড়ী অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য ছিনিয়ে আনছিলেন বিজয়, বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়ে সেখানে মিশরের সপক্ষে জনমতকে সংগঠিত করছিলেন, আইয়ুবী তখন ত্রিদলীয় জোটকে পরাজিত করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন হলবের দিকে। মুসলিম আমীরদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সুলতান আইয়ুবীর বিজয় ওদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করেই ক্ষান্ত হননি সুলতান, আলাদা আলাদা ভাবে গুমাস্তগীন, সাইফুদ্দিন ও আল মালেকুস সালেহের ক্যাম্পে চড়াও হয়ে তাদের তছনছ করে দেন। বাধ্য হয়ে প্রাণের মায়ায় এই তিন শক্তির সৈন্যরা তখন পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করার পর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পলাতক বাহিনীর পিছু ধাওয়া করলেন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথের ছোট ছোট রাজ্য ও কেল্লা একের পর বশীভূত করে এগিয়ে চললেন হলবের দিকে।

হলব ছিল সম্মিলিত বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং আল মালেকুস সালেহের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল ও সামরিক কেন্দ্র। সুলতান আইয়ুবী একবার এ শহর অবরোধ করে শেষে অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে। আল মালেকুস সালেহ আইয়ুবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে সেখানকার মুসলমানদেরকে তার বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল যে, তারা মরণপণ করে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সুলতান আইয়ুবী

তাদের শৌর্য বীর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।
সুলতান আইয়ুবী তিন বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার পর স্বাভাবিকভাবেই তিন বাহিনীর সৈন্যরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুলতান আইয়ুবী এ বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করলে মোকাবেলা করার পরিবর্তে তারা অস্ত্রসমর্পন করে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বন্দীত্ব কবুল করে নেয়। অনেকে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যোগ দেয় আইয়ুবীর বাহিনীতে।
আইয়ুবী তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে হলবের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কারণ তিনি হলববাসীদের নতুন করে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর সৈন্যদের দু'ভাগে ভাগ করলেন। একদলকে পলায়নপর সৈন্যদের পিছু ধাওয়া ও পথের গুরুত্বপূর্ণ চৌকি, ফাঁড়ি ও ছোট ছোট রাজ্য জয় করার কাজে লাগালেন। এদের নেতৃত্বে থাকলেন তিনি নিজে। অন্য দলটি সাজালেন কমাণ্ডো বাহিনী দিয়ে। তাদের বললেন, 'পলায়নপর সৈন্যদের এড়িয়ে ভিন্ন পথে দ্রুত তোমরা হলবের দিকে এগিয়ে যাও। পথে বড় ধরনের সেনাদলকে পালাতে দেখলে ওদের পেরিয়ে গিয়ে সামনে থেকে অবরোধ করে দাঁড়াবে। তাতে ভয় পেয়ে তারা কালবিলম্ব না করে আত্মসমর্পন করতে ছুটে আসবে।'
হলবের সৈন্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে হলবে ছুটে যাচ্ছিল। সামনে অগ্রসর হওয়ার পর তাদের কমাণ্ডাররা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেককে একত্রিত করলো। তারপর সবাইকে নিয়ে পূনরায় ছুটলো হলবের দিকে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা দেখতে

পেলো, সামনে সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী রাস্তা অবরোধ করে বসে আছে। হলবের সৈন্যরা রাস্তায় আটকা পড়ে গেল। তাদের আর যুদ্ধ করার শক্তি ছিল না। শক্তি-বলই শুধু নিঃশেষ হয়নি তাদের, সাথে সাথে অস্ত্র এবং রসদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে খাদ্য এবং পানির সমস্যা ছিল তীব্র। সামনে আইয়ুবীর বাহিনী পথ অবরোধ করে বসে আছে, পেছন থেকেও ধেয়ে আসছে আইয়ুবীর ফৌজ, এ অবস্থায় চারদিকে ওরা কেবল মৃত্যুর অন্ধকারই দেখতে পেলো। সৈন্যরা রাস্তায় আটকে পড়ে যখন মৃত্যুর প্রহর গুণছিল তখন সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর একটি দল ঘুরে পাশ থেকে অতর্কিত হামলা চালালো তাদের ওপর। তারা প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করার পরিবর্তে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হলবের সৈন্যরা, তোমরা অস্ত্রসমর্পণ করো। আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাই না। তোমাদের সাথে আমাদের কোন লড়াই নেই। আমাদের লড়াই তোমাদের ক্ষমতালিপ্সু শাসকদের সাথে।'

এ ঘোষণা শুনে কেউ আর লড়াই করতে এগিয়ে এলো না, সকলেই অস্ত্রসমর্পন করে মেনে নিল আইয়ুবীর বশ্যতা। হলবের পথে পথে এ নাটক চলতেই লাগলো।

সুলতান আইয়ুবী ছিলেন রণাঙ্গণের একেবারে পিছনে। তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছতে লাগলো, 'হলবের সৈন্যরা সর্বত্র অস্ত্রসমর্পণ করছে।' তিনি বললেন, 'যদি এ সেনাবাহিনী খৃস্টানদের হতো, তবে আমি এদের কাউকে ক্ষমা করতাম

না। একজনকেও জীবিত রাখতাম না। কিন্তু এরা যে আমার ভাই! কেন তারা অস্ত্র ধরেছে তাই তারা জানে না। তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব এরা যদি অস্ত্রসমর্পণ করে তবে এদের কাউকে কোন রকম কষ্ট দেবে না। আমি আমার কষ্ট কাউকে বুঝাতে পারবো না। এদের সবাইকে ক্ষমা করে দেয়ার পরও আমার মনে কোন রকম শান্তি আসবে না। যতদিন বেঁচে থাকি, আমার আত্মা হাহাকার করে বলতে থাকবে, আইয়ুবী, তুমি তোমার মুসলমান ভাইদের বুঝাতে পারোনি, কেবল দ্বীনের জন্যই তোমার এ লড়াই। যদি এটা বুঝাতে পারতে, তবে এরা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতো না। খালি হয়ে যেতো না মুসলিম মায়েদের শত শত বুক। মুসলিম বোনদের অশ্রু ও হাহাকার ভারী করে তুলতো না আকাশ বাতাস। হায়! আমার শাসনকালেই মুসলমানের অস্ত্র নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, এ ব্যর্থতা তো আমার! যদি আমাদের এ ভাইয়েরা আজ বন্ধু ও শত্রু চিনতে পারে, তবে এই জিল্লতির লড়াই থেকে বেঁচে যাই আমি।'

পরের দিনই আল্লাহ সুলতান আইয়ুবীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তিনি দেখলেন, দুই অশ্বারোহী তার দিকে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে সাদা পতাকা। তাদের ডানে বামে আইয়ুবীর বাহিনীর দুই কমাণ্ডার। নিকটে এসে অশ্বারোহীরা থেমে গেল। আইয়ুবীর এক কমাণ্ডার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, 'হলবের শাসক আল মালেকুস

সালেহ আপনার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এ দুই দূত আপোস মীমাংসার প্রস্তাব বহন করে এনেছে।'

এক দূত এগিয়ে সন্ধি প্রস্তাবের পত্রটি সুলতান আইয়ুবীর হাতে সমর্পণ করলো। সুলতান আইয়ুবী পত্র পাঠ করে দূতকে বললেন, 'আল মালেকুস সালেহকে বলবে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যখন যুদ্ধের আগে তার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, তখন আপনি তার দূতকে ফেরাউনের মত অপমান করে সে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজ আল্লাহ জাল্লে শানুহু আমাকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, তার সৈন্য ও শক্তিকে যাঁতায় পিষে শেষ করতে পারি। কিন্তু আমার শত্রু তুমি নও, তুমি সেই পিতার সন্তান, যিনি খৃস্টান শক্তিকে নতজানু করে রেখেছিলেন যুগের পর যুগ। আর তুমি খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের গাঁটছড়া বেঁধে তোমারই পিতার গড়া সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছো! তাকে গিয়ে বলবে, আমি তাকে ক্ষমা করেছি, আর দোয়া করছি আল্লাহও যেন তাকে ক্ষমা করে দেন।'

সুলতান আইয়ুবী সন্ধি প্রস্তাবে আরো কিছু শর্ত আরোপ করে ওদের সম্মতি নিয়ে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিলেন। সন্ধির প্রথম শর্ত ছিল, আল মালেকুস সালেহ তার সৈন্য বাহিনী হলবে ফিরিয়ে নিতে পারবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, আইয়ুবীর সৈন্যরা যখন হলবে প্রবেশ করবে, তখন তাদের অগ্রযাত্রায় কোন রকম বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না আল মালেকুস সালেহের সৈন্যরা।

এ সন্ধির শর্ত অনুসারে আস-সালেহ তার সৈন্য হলবে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সাইফুদ্দিনও পিছু সরে পালিয়ে মুশেলের দিকে ফিরে গেল। গুমাস্তগীন তার কেল্লা হারানে ফিরে না গিয়ে হলবে যাত্রা করলো।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর সৈন্য অভিযান আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে হলবের পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান তুর্কমানে স্থায়ী ক্যাম্প করে সেখানে অবস্থান নিলেন। এ ক্যাম্পে অবস্থান কালে একদিন একটি অভাবিত ঘটনা ঘটলো। হলব থেকে এক কাসেদ তাঁর কাছে এসে আল মালেকুস সালেহের একটি বিশেষ পত্র তাঁর হাতে তুলে দিল। সুলতান আইয়ুবী পত্রটি পড়ে চমকে উঠলেন। এ চিঠি আসলে আইয়ুবীর কাছে লেখা হয়নি। চিঠিটি আল মালেকুস সালেহ লিখেছিল সাইফুদ্দিনের কাছে। কিন্তু যে কাসেদকে আল মালেকুস সালেহ নির্বাচন করেছিল এ চিঠি সাইফুদ্দিনের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য, সে ছিল মূলতঃ আইয়ুবীর গোয়েন্দা। তাই চিঠিটি সাইফুদ্দিনের কাছে না গিয়ে এসে পৌঁছলো আইয়ুবীর হাতে। চিঠিতে আল মালেকুস সালেহ লিখেছিল:

ভাই সাইফুদ্দিন! আপনার চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার ওপর যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনার এ ক্ষোভের সঙ্গত কারণও আছে। আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে অস্ত্রসমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছি। নি:সন্দেহে এটা আমাদের সংকল্প ও শপথের পরিপন্থী। কিন্তু এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আপনি জানেন, আমার

সেনাবাহিনী তাঁর বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আমার সৈন্যরা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত এবং ক্লান্ত। বহু সৈন্য আগেই নিহত হয়েছিল, বাকীদেরও অনেকে ছিল আহত। তারা কেউ যুদ্ধ করার অবস্থায় ছিল না। এ অবস্থায় আহত সৈন্যদের মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিলে তাতে কোন লাভ হতো না আমাদের। আমার সেনাপতি ও কমাণ্ডাররা অবস্থাদৃষ্টে আমাকে পরামর্শ দিল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে সন্ধির নামে প্রতারণা করে তাদের জীবন বাঁচাতে। তাঁদের বেষ্টনী থেকে নিজের সৈন্যদের মুক্ত করার আর কোন পথ না দেখে এ প্রস্তাব আমি মেনে নিতে বাধ্য হই। ফলে কি পরিস্থিতিতে এবং কেন আমি সুলতান আইয়ুবীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন।

সম্মানিত ভাই গাজী সাইফুদ্দিন! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কিছুটা সময় হাতে পাওয়ার জন্য এ সন্ধি করেছি। এ সন্ধি না করলে আমার কাছে আজ আর একটি সৈন্যও থাকতো না। আমি এখন হলবে বসে আমার সৈন্যদেরকে নতুন করে সাজাচ্ছি। নতুন সৈন্যও ভর্তি করছি। আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দাবী অনুসারে এ শর্ত মেনে নিয়েছি যে, তাঁর বাহিনী হলব অভিমুখে অগ্রসর হলে তাঁর অগ্রগতি প্রতিরোধ করবো না। কিন্তু তিনি যখন এখানে আসবেন, তখন তার সৈন্যদের এমন ভাবে বাঁধা দেয়া হবে, যে বাঁধার কথা তিনি চিন্তাও করেননি। আপনিও আপনার সৈন্যদেরকে নতুনভাবে আদ্যোপান্ত সাজিয়ে নিন। কারণ

সুলতান আইয়ুবীর শক্তি নিঃশেষ করতে হলে আবারো আমাদের মিলিতভাবে যুদ্ধে নামতে হবে।'

এ চিঠিতে আরো অনেক কিছু লেখা ছিল। ঐতিহাসিকরা একমত হয়েছেন, আল মালেকুস সালেহ সুলতান আইয়ুবীকে ধোঁকা দিয়েছিলেন। সাইফুদ্দিনের চিঠির উত্তরে তিনি যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ভাগ্যক্রমেই তা সুলতান আইয়ুবীর হাতে গিয়ে পড়েছিল। যদি এ চিঠি আইয়ুবীর গুপ্তচরের হাতে না পড়ে অন্য কারো হাতে পড়তো তাহলে আইয়ুবী কোনদিনই এসব তথ্য জানতে পারতেন না। ইউরোপের ঐতিহাসিকরা অবশ্য বলেছেন, চিঠি খামে পুরার সময় ভুলক্রমে তা সুলতান আইয়ুবীর নামের খামে ঢুকানো হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিকরা একমত, সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগ সবখানে এমন সতর্ক ও দক্ষতার সাথে নিযুক্ত ছিল যে, তাঁর গোয়েন্দাই এ কাজটি করেছিল।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছেন, এ চিঠি সুলতান আইয়ুবীকে এমন কঠিন চিন্তায় ফেলেছিল যে, তিনি কয়েক ঘন্টা তার সঙ্গী-সাথীদের সাথেও কথা বলেননি। তাঁবুতে একা বসে এ চিঠির বিষয় নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। যাইহোক, একসময় তাঁর এ অবস্থা কেটে গেল। তাবুর বাইরে এসে তিনি সঙ্গীদের বললেন, 'তোমাদের জন্য একই সাথে বেদনা ও খুশীর একটি খবর আছে। বেদনার কারণ হচ্ছে, আল মালেকুস সালেহ সন্ধির নামে আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। খুশীর কারণ হচ্ছে, সে যে ধোঁকা দিয়েছে সেই খবরটি আমরা

জেনে গেছি। আমার কাসেদ আমাকে আজ এমন একটি পত্র দিয়েছে, যাতে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে।'

তিনি আল মালেকুস সালেহ ও তার দোসরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখনি হলবে চড়াও না হয়ে তিনি দ্রুত আল-জাজিরা, দাইয়ার ও বাকার থেকে নতুন সৈন্য পাঠানোর আদেশ দিয়ে সেনাপতিদের নিয়ে বসলেন নতুন করে যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরীর কাজে। আরো একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরীতে মগ্ন হয়ে পড়লেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও তাঁর বিশ্বস্ত জাদরেল সেনাপতিগণ।

তখন ১১৭৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাস। সময়টা ছিল মুসলমানদের জন্য পরম পূণ্য ও সৌভাগ্য আহরণের। হিজরী ৫৭০ সালের পবিত্র রমজানের মোবারক মাস শুরু হয়েছে। এ সময় তিনটি রাজ্যের মুসলিম আমীর নূরুদ্দিন জঙ্গীর পুত্র আল মালেকুস সালেহ, বিখ্যাত হারান দুর্গের অধিপতি গুমাস্তগীন ও মুশালের আমীর সাইফুদ্দিন গাজী একজোট হয়ে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে মাঠে নেমে চরম পরাজয় বরণ করে পালাচ্ছিল। এদের সহযোগিতা ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে এ পথে নামিয়ে ছিল খৃস্টানরা। যুদ্ধের জন্য সরবরাহ করেছিল ঘোড়া, উট ও জ্বালানি। সরবরাহ করেছিল যুদ্ধের সব রকম অস্ত্র ও গোলা বারুদ।

এর কারণও ছিল। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর খৃস্টানরা বুঝেছিল, সুলতান আইয়ুবীকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা

অসম্ভব। কিন্তু তাঁকে পরাজিত করতে না পারলে তাদের মূল উদ্দেশ্য কোনদিন সফল হবে না। যদিও ফিলিস্তিন এখন তাদেরই দখলে, তাতে দুনিয়া থেকে ইসলাম বিদায় নেবে না। ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে হলে জয় করতে হবে ইসলামের কেন্দ্র ভূমি মক্কা ও মদীনা। জয় করতে হবে আরব ভূমি। কিন্তু আইয়ুবী বেঁচে থাকলে তা সম্ভব নয়। আবার আইয়ুবীকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় ষড়যন্ত্র ও কুটনৈতিক যুদ্ধই এখন তাদের একমাত্র ভরসা। এ কূটনৈতিক যুদ্ধের উপায় খুঁজতে গিয়ে খৃস্টানরা মুসলামনদের মধ্যে তিনটি দুর্বলতা আবিষ্কার করলো। এ দূর্বলতার পথ ধরেই মুসলমানদের নিঃশেষ করার সংকল্প করলো খৃস্টানরা। দুর্বলতা হিসাবে তারা চিহ্নিত করলো ক্ষমতার লালসা, অর্থ ও সম্পদের লালসা, এবং নারী ও ভোগের লালসা।

ক্রুসেডাররা ইউরোপ থেকে যখন প্রথম এখানে আসে তখন তাদের মনে ছিল সীমাহীন আত্মবিশ্বাস। তারা এ আশা-ভরসা নিয়েই এখানে এসেছিল, উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও নৌশক্তির বলে মুসলমানদেরকে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করে দিতে পারবে। প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস দখলের পর এ আত্মবিশ্বাস তাদের আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, খানায়ে কাবা এবং মদীনাতুন্নবীও সহজেই তাদের অধিকারভুক্ত হবে। আর এটুকু করতে পারলেই দুনিয়া থেকে ইসলাম বিদায়ের পথ খুলে যাবে।

কিন্তু তারা জানতো না, ধর্ম কোন গাছ নয় যে, তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা বা কেটে ফেলা যাবে, আর উপড়ে ফেলার সাথে সাথেই তা শুকিয়ে মারা যাবে। অথবা ধর্ম কোন বইয়ের পাতাও নয় যে, তা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া যাবে। ধর্ম হলো বিশ্বাস ও চেতনার নাম। যে চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের মন ও মগজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের সকল কর্মকাণ্ড। মানুষ জীবনের পথ পাড়ি দেয় এ বিশ্বাসের সম্বল বুকে নিয়ে। নিজের চেতনার রঙেই রাঙিয়ে তোলে মানুষ তার কর্মের ভুবন।

মানুষ মারা যায় কিন্তু তার এ বিশ্বাস ও চেতনা মরে না। ফলে মানুষকে হত্যা করলেই কোন মতবাদ ও বিশ্বাস শেষ হয়ে যায় না। বরং তার সাথীদের মনে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর বিশ্বাসের প্রতি মমত্ববোধ বেড়ে যায়। যে মমত্ব ও ভালবাসা বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার অমোঘ শক্তি দান করে। তাকে করে তোলে আরো সজীব ও প্রাণবন্ত।

কোন ধর্মকে নিঃশেষ করার জন্য তাই প্রয়োজন, মানুষের এই বিশ্বাস ও চেতনাকে ধ্বংস করা। মানুষের মনে, তার চিন্তা চেতনায়, বিশ্বাস যত শিথিল হবে, ততই তা এগিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। মানুষের মন মগজে ক্ষমতার মোহ, বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা যত বাড়বে, চিরন্তন ও শ্বাশ্বত চেতনা ততই ম্রিয়মান হতে থাকবে। কারো চিত্তে আরাম ও আমোদপ্রিয়তা জেঁকে বসলে তার বিশ্বাস ও আদর্শের বন্ধন শিথিল হতে থাকে। মানুষ তখন মানবিকতার পথ ছেড়ে হয়ে

উঠে স্বেচ্ছাচারী, বেপরোয়া আর অবাধ্য। সভ্যতার বাগানে অসভ্যতার, অমানবিকতার বিস্তার ঘটে এমন করেই।

আইয়ুবীর বিরুদ্ধে প্রতিটি ময়দানে পরাজিত হওয়ার পর ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে এই জাল ও মোহ সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠল। প্রথমে মিশরে ও আরবের বিভিন্ন এলাকায় এ জাল বিস্তারের জন্য মাঠে নামলো ওরা। নিজের অজান্তেই মুসলমান আমীররা এ জালে আটকা পড়তে শুরু করলো। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল মুসলিম সালতানাতের আমীর ওমরাদের মধ্যে। মুসলিম মিল্লাতের দুর্ভাগ্য, দুশমনের এ কৌশল ও চক্রান্ত টেরই পেলো না বড় বড় অনেক মুসলিম নেতৃবৃন্দ। মানুষ যখন জানতেই পারে না সে আক্রান্ত, সে অবস্থায় আঘাত প্রতিরোধের তো প্রশ্নই উঠে না। ফলে দুশমনের চক্রান্তের জালে ক্রমেই জড়িয়ে পড়লো মুসলমান আমীর ওমরার দল। প্রথমে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভের কাছে পরাজিত হলো তারা। তারপর সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভের কাছে। আর যখন এ দু'টো কারো করায়ত্ব হয়ে গেলো, আরাম আয়েশ হাতছানি দিয়ে ডাকলো তাকে। ভোগের কাছে যখন সে নতি স্বীকার করলো, মদ ও নারীর লোভ পেয়ে বসলো তাকে। এভাবেই ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাস ত্যাগ করে তারা হয়ে পড়লো ভোগসর্বস্ব একশ্রেণীর জীব। ফলে এখন আর খৃস্টান নয়, আইয়ুবীকে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল এসব ক্ষমতালিপ্সু জীবদের।

সাইফুদ্দিন গাজীকে লেখা আল মালেকুস সালেহের চিঠি

পাওয়ার পরের কথা। আইয়ুবীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো খৃস্টানদের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও কুটিল চক্রান্তের শিকার মুসলিম আমীরদের মুখগুলো।

নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সালাহউদ্দিন আইয়ুবী প্রথম যেদিন এ বিষযুক্ত মধুর ছোবলে আক্রান্ত মুসলিম আমীরদের দিকে তাকিয়েছিলেন, বেদনায় শিউরে উঠেছিলেন তারা। আমীরদের চেতনা ও বিশ্বাস কি করে নষ্ট হচ্ছে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করলেন দুশমনের এক অঘোষিত নিরব যুদ্ধ। দুশমনের মিছরির ছুরি ও অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যু ঘটছে মুসলমানিত্বের, অথচ সে জানতেই পারছে না মুসলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে, মুসলিম নাম নিয়ে জীবন ধারণ করার পরও তার আমল কেন অমুসলমানের মতই উদ্দেশ্যহীন, চেতনাহীন ও বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে।

আইয়ুবীর মনে পড়ে গেল, মুসলিম আমীর ও শাসক শ্রেণীর মনে এ লালসা ও নেশা ঢুকিয়েই ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল ফিলিস্তিন। অধিকার করে নিয়েছিল বহু ছোট ছোট মুসলিম রাজ্য ও পরগণা। যেখানে ইহুদী ও খৃস্টানরা সরাসরি করায়ত্ব করতে পারল না, সে রাজ্যের শাসক শ্রেণীর মধ্যে এ বিষ এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল যে, সেসব মুসলমান আমীর ও শাসকরা হয়ে দাঁড়াল ওদের তল্পীবাহক। দেখতে দেখতে ইহুদী ও খৃস্টানরা সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানদের এমন মোড়ল সেজে বসলো, কে যে ওইসব আমীরদের বন্ধু আর কে নয়, বুঝে উঠা দুষ্কর হয়ে

উঠলো। একজন মুসলমান আমীর বা সেনাপতি, সে যে কার অনুগত, মুসলিম উম্মার নাকি খৃস্টানদের, এ প্রশ্নের কোন নিরেট জবাব ছিল না কারো হাতে। অবিশ্বাসের এক অদৃশ্য ছোবল প্রত্যেকেই অনুভব করছিল নিজ নিজ বুকে।

নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীর সামনে এ ছিল এক বিরাট সমস্যা। নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সুলতান আইয়ুবী এ সমস্যা আরো তীব্রভাবে অনুভব করলেন। আর এ গাদ্দারদের মোকাবেলার জন্যই সর্বক্ষণ তাকে পেরেশান থাকতে হতো। ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা করে সুলতান আইয়ুবী পথে নামলে পদে পদে তিনি খৃস্টানদের তল্পীবাহক কালেমা পড়া এসব আমীরদের বাঁধার সম্মুখীন হন। ফলে খৃস্টানদের সাথে মোকাবেলা করার পরিবর্তে ওদের সাথেই তাকে জড়িয়ে পড়তে হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। আর খৃস্টান ক্রুসেডাররা ওদের উৎসাহ ও মদদ দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসে এ তামাশা উপভোগ করছিল।

এর আগে সুলতান আইয়ুবী প্রতিটি রণক্ষেত্রে খৃস্টানদের পরাস্ত করে ওদের যে ক্ষতি করেছিলেন, এভাবে ভ্রাতিঘাতি যুদ্ধ বাঁধিয়ে ওরা তার প্রতিশোধ নিচ্ছিল। তারা মুসলমান আমীরদেরকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কেবল উৎসাহ নয়, সামরিক সাহায্যও অব্যাহত রাখলো। এ বিব্রতকর লড়াইয়ে সুলতান আইয়ুবী প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট ভোগ করছিলেন। কিন্তু যখন মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর পুত্র আল মালেকুস সালেহের সাথে তাকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হলো

তখন এ কষ্ট তীব্র আকার ধারণ করলো। পিতার মৃত্যুর পর খৃস্টানদের তল্পীবাহক আমীররা সালেহকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে। তার সাথে যোগ দিয়েছিল মুশালের আমীর সাইফুদ্দিন গাজী ও হারান দুর্গের অধিপতি গুমাস্তগীন। তিনি ভেবেছিলেন, সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। বিশেষ করে আল মালেকুস সালেহ সন্ধি প্রস্তাব পাঠালে তিনি মনে করলেন, যাক, এতদিনে সালেহ তার ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু গোয়েন্দার চিঠিতে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে সীমাহীন পেরেশানীতে পড়ে গেলেন আইয়ুবী। ফিলিস্তিন অগ্রযাত্রা মুলতবী রেখে এ বিশ্বাসঘাতকদের সাথে শেষবারের মত হিসাব নিকাশ চুকিয়ে নিতে সংকল্পবদ্ধ হলেন তিনি।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাস। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে একটি পর্ণ কুটিরে আশ্রয় নিল আল মালেকুস সালেহের ঐক্যজোটের অন্যতম সদস্য সুলতান সাইফুদ্দিন গাজী। অপর সদস্য হারানের সেনাপতি গুমাস্তগীন ভয়ে হারানে না ফিরে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটলো হলবের পথে। তিনজনই তাদের ক্যাম্পের মূল্যবান তাঁবু, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়েছিল। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা তাদের সৈন্যদের যুদ্ধবন্দী করার সাথে সাথে সেগুলোও করায়ত্ব করলো।

যুদ্ধবন্দীদের হাজির করা হলো সুলতান আইয়ুবীর সামনে। তিনি তাদের বললেন, 'খোদার কসম, ক্ষমতার মোহ বা বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য আমার সৈনিকরা অস্ত্র ধরেনি। আমরা

লড়াই করছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের আপাতত টার্গেট ফিলিস্তিন বিজয়। ফিলিস্তিনের এ অগ্রযাত্রার পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সালেহ, সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীন। তাই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হয়েছে। তোমাদের সাথে আমাদের কোন দুশমনী নেই। তোমরা মুসলমান, আমাদেরই ভাই। তোমরা যদি এই ভ্রাতৃত্ব মেনে নাও, ওয়াদা করো আর কখনো ইসলামের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধক হবে না, তবে এখন থেকে তোমরা স্বাধীন। আমি বিনা শর্তে তোমাদের সবাইকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমরা এখান থেকেই যার যার বাড়ী চলে যেতে পারো। যারা ইসলামের জন্য আমাদের সাথে ফিলিস্তিন অভিমুখে যেতে চাও, তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি আমার বাহিনীতে শামিল হওয়ার জন্য।'

সুলতান আইয়ুবীর এ উদারতা ও মহত্ব ছিল জাতির প্রতি তার অসম্ভব ভালবাসা ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধের অনন্য স্বাক্ষর। তিনি যে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলও পেয়েছিলেন সাথে সাথে। যুদ্ধবন্দীদের কেউ কেউ ফিরে গেলেও অধিকাংশই আইয়ুবীর বাহিনীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের ময়দান থেকে আল মালেকুস সালেহ, সাইফুদ্দিন গাজী ও গুমাস্তগীনের পলায়ন কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। এর রাজনৈতিক ও মনস্তাত্বিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। গুমাস্তগীন হারানে না গিয়ে হলবে আল মালেকুস সালেহের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। হারান ছিল যুদ্ধের ময়দান থেকে সবচে কাছে।

সুলতান আইয়ুবী তাকে অনুসরণ করে হারানের দিকে যাত্রা করতে পারে এই ভয়ে গুমাস্তগীন নিজের কেল্লার মায়া ছেড়ে পালিয়েছিল। এতেই বুঝা যায়, সে কতটা ভয় পেয়েছিল।
অন্যদিকে একাধারে মুশেলের আমীর, শাসক ও সেনাপতি সাইফুদ্দিন আশ্রয় নিয়েছিল এক অজ্ঞাত পর্ণকুটিরে। বীর যোদ্ধা ও কুশলী সেনাপতি হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু সেই সুনামকে ছাই চাপা দিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল পর্ণকুটিরে।
এমনটিই হয়। মুসলমান তাঁর ঈমান বিক্রি করে দিলে সিংহ থেকে পরিণত হয় ভেড়ায়। কারণ যে ঈমান তার ঢাল ও তলোয়ার, তাই সে হারিয়ে ফেলেছে। সাইফুদ্দিন এতই সৌখিন ও বিলাসপ্রিয় ছিল, যুদ্ধের ময়দানেও হেরেমের বাছাইকৃত সুন্দরীদের সে সঙ্গে রাখতো। সাথে থাকতো মদের বোতল ও সুরা পাত্র। আর থাকতো তার অতি প্রিয় সুন্দর সুন্দর পোষাপাখী। কিন্তু পালাবার সময় এ সব আমোদ-স্ফুর্তির উপরকণ ফেলে রেখেই পালাতে হয়েছিল তাকে। তার সহ-সেনাপতি পালাবার সময় তাকে পরামর্শ দিয়েছিল মুশেল যেতে, কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডোদের ভয়ে এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে সাইফুদ্দিন তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে মুশেলের পথ থেকে একদিকে সরে পড়েছিলো। ভয় পাচ্ছিল, আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা তার পিছু নিল কিনা!
সাইফুদ্দিন যেদিকে পালিয়েছিল সে অঞ্চলটা ছিল খুবই দুর্গম। কাটাগুল্ম পরিবেষ্টিত পাহাড়ী উপত্যকা, মাঝে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ প্রান্তর। আত্মগোপন করার জন্য খুবই উপযুক্ত

জায়গা।
তিনি সেই দুর্গম অঞ্চল দিয়ে এগিয়ে যেখানে থামলেন, সে জায়গাটা মুশেল শহর থেকে তখনো বেশ দূরে।
রাত তখন গভীর। কাক জ্যোস্নার মধ্যে কিছু ছোট ছোট পাহাড়ী বাড়ীঘর নজরে এলো তার। সাইফুদ্দিন এগিয়ে গেলো সেই বাড়ীগুলোর দিকে। প্রথম বাড়ীর সামনে গিয়েই দরজায় আঘাত করলো। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে উঠে এলো এক বৃদ্ধ। মুখে তার সফেদ দাড়ি। দরজা খুলেই দেখতে পেলো সামনে তিনজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে। তারা এমনভাবে হাপাচ্ছিল, দেখেই বুঝা গেল, প্রাণভয়ে কোথাও থেকে পালিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ তাদের জিজ্ঞেস করলো, 'মনে হচ্ছে তোমরা মুশেলের সেনাবাহিনীর লোক! এত রাতে কি মনে করে দরজার কড়া নাড়লে?'
'আগে আমাদের একটু পানি খাওয়াও।'
'অ, হ্যাঁ, তাইতো! গত দু'দিন যাবত যারা আসছে, সবাই এসেই প্রথমে পানি খেতে চায়।' বৃদ্ধ পানি আনতে ভেতরে ঢুকে গেল।
পানি নিয়ে এলে সাইফুদ্দিন তাকে প্রশ্ন করলো, 'কারা দু'দিন যাবত এদিকে আসছে?'
'দু'দিন যাবত মুশেলের সৈন্যরা এদিক দিয়ে পালাচ্ছে। তারা পানি পান করার জন্য এখানে থামে, পানি খাওয়া হলেই আবার যাত্রা করে মুশেলের দিকে।'
'এখান থেকে মুশেল কত দূর?' সাইফুদ্দিন জিজ্ঞেস করলো।
'যদি কোথাও না থামো তবে ভোর হওয়ার সাথে সাথেই পৌঁছে যেতে পারবে।' বৃদ্ধ বললো, 'এ গ্রামও মুশেলের

এলাকাধীন।'
'আমরা বড় ক্লান্ত। যদি রাত কাটানোর মত জায়গা পাই তবে আজ আর এগুবো না। তোমার এখানে এ রাতটুকুর জন্য থাকার মত জায়গা হবে?' সাইফুদ্দিন বললো।
'জায়গা তো থাকে মানুষের মনের মধ্যে।' বৃদ্ধ উত্তরে বললো, 'এ গরীবের ঘরে যদি তোমরা থাকতে পারো, তবে নিশ্চয়ই জায়গা হবে। নেমে ভেতরে এসো।'
তিনজন ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলো। বুড়ো ঘোড়াগুলো বাড়ীর পিছনে নিয়ে বেঁধে রেখে ফিরে এলো কামরায়। মশালের আলোয় আগন্তুকদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো বৃদ্ধ। মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো ওদের পোষাক।
'আমাকে চিনতে চেষ্টা করছো?' সাইফুদ্দিন হেসে বললো।
'তুমি তো কোন সিপাহী নও!' বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললো, 'তুমি খুব বড় কোন অফিসার বা সেনাপতি হবে!'
'ইনি মুশেলের আমীর গাজী সাইফুদ্দিন।' সঙ্গী একজন বললো, 'তুমি কোন সাধারণ লোককে মেহমান রাখোনি। তোমার মেহমানদারীর উপযুক্ত মূল্য তুমি পাবে। আমি সহকারী সেনাপতি আর এ ব্যক্তি এক উর্ধতন সেনা কমাণ্ডার।'
'একটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো।' বুড়োকে উদ্দেশ্য করে সাইফুদ্দিন বললো, 'এমনও হতে পারে, আমাকে দীর্ঘদিন তোমার ঘরে অবস্থান করতে হবে। আমি দিনের বেলা বাইরে বের হবো না। আমি এখানে আছি এ কথা কোনভাবেই জানাজানি হওয়া চলবে না। কারণ কেউ জেনে

গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি এমন কিছু ঘটে যায় তবে আমি তো বিপদে পড়বোই, তোমার ভাগ্যেও দুর্ভোগ ছাড়া কিছুই জুটবে না। অতএব সাবধান! আর যদি তুমি গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারো, তবে অশেষ মূল্য পাবে।'

বৃদ্ধ বললো, 'এটা মুশেলের অঞ্চল। এর সব বাড়ীঘর আপনার। আপনি আপনার নিজের রাজ্যে যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী থাকবেন। আমরা আপনার নগন্য প্রজা। আমাদের যেভাবে হুকুম করবেন সেভাবে চলবো। যতদিন এখানে থাকবেন, অন্তর দিয়ে আপনার খেদমত করবো। আপনি যদি লুকিয়ে থাকতে চান তবে তাই হবে। আমাকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আপনার আস্থা অর্জনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি, আমার কলজের টুকরো ছেলেকে আমি আপনার সেনাবাহিনীতে দিতেও দ্বিধা করিনি।'

'আমি তাকে সেনাপতি পদে প্রমোশন দেবো।' সহকারী সেনাপতি বললো।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'এক পিতা হিসাবে এ কথা শুনে আমার খুশী হওয়া উচিত। কোন্ বাপ ছেলের উন্নতি চায় না! কিন্তু বড় কষ্টে আজ বলতে ইচ্ছে করে, দয়া করে যদি তাকে আপনি সেনাবাহিনী থেকে নিস্কৃতি দেন তাহলেই আমি বেশী খুশী হবো।' বৃদ্ধের উদাস চোখে ভাসতে লাগলো ছেলের চেহারা।

'ঠিক আছে, আমি তাকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেবো।' সাইফুদ্দিন বললো, 'জানি, প্রত্যেক পিতাই চায়, তার সন্তান

যেন বেঁচে থাকে। আমি তাকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দেবো।'

'উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন স্বার্থকতা নেই। আমি তাকে এ জন্য সেনাবাহিনীতে পাঠাইনি, লড়াইয়ের সময় দুশমনের সামনে বুক পেতে দেয়ার পরিবর্তে কাপুরুষের মত সে পেছনে পড়ে থেকে জীবন বাঁচাক। এক পিতা হিসাবে সে বেঁচে থাকুক তা আমি অবশ্যই চাই, কিন্তু তারচে বেশী করে চাই, জাতির খেদমতে সে জীবন উৎসর্গ করুক, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে প্রয়োজনে বিলিয়ে দিক নিজের জীবন।' বৃদ্ধ বললো, 'আমি তাকে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়েছিলাম মহৎ চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। একদিন এ আদর্শের জন্যই আমিও অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম। যখন আমি সৈনিক ছিলাম, আপনি তখন জন্মই গ্রহণ করেননি। আল্লাহ আপনার পিতা কুতুবুদ্দিন মরহুমকে জান্নাতবাসী করুন, আমি তারই অধীনে সেনাবাহিনীতে ছিলাম। কিন্তু আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, আর আপনি আমার পুত্রকে ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছেন। আমি তার শাহাদাতের আশা করেছিলাম, কিন্তু আত্মঘাতী মৃত্যু আশা করিনি।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নামে মাত্র মুসলমান।' সাইফুদ্দিন বললো, 'সে উচ্চাভিলাসী ও ক্ষমতালিপ্সু। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সে মরহুম নূরুদ্দিন জঙ্গীর নাবালক পুত্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরেছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেবল জায়েজ নয়,

ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'সম্মানিত মুরুব্বি!' সহকারী সেনাপতি বললো, 'এসব রাজনৈতিক বিষয় আপনি বুঝবেন না, আমরা ভাল করেই জানি কে মুসলমান আর কে কাফের!'

'ওরে আমার ছেলেরা!' বৃদ্ধ বললো, 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আমার বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। আমার বাবা নব্বই বছর বয়সে মারা যান। আমার দাদা পঞ্চাশ বছর বয়সে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হন। দাদাজান তাঁর সময়কার যুদ্ধের ঘটনাবলী ও ইতিহাস আমার বাবাকে বলে যান। বাবাও দাদার ও তাঁর যুগের জিহাদের ঘটনাবলী আমার অন্তরে গেঁথে দিয়ে গেছেন। তাই আমি দাবী করতে পারি, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। রাজ্য ও ক্ষমতার নেশায় যেখানে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেখানে একদিন না একদিন কোন এক ভাই পালিয়ে গরীবের কুটিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এমন ঘটনা তোমাদের যুগের আগেও বহু ঘটেছে, তাদেরও ঠিক এমনিই পরিণতি ঘটেছিল। তোমাদের তিন বাহিনীকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কিভাবে বিতাড়িত করেছে সে দৃশ্য তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি। তোমাদের সাথে যদি আরো সৈন্য থাকতো, তারাও তোমাদের মত পালানোর জন্য এভাবেই পেরেশান ও ব্যতিব্যস্ত থাকতো। গত দু'দিন ধরে যাদেরকে এ পথে পালিয়ে যেতে দেখেছি, সবার মাঝেই ছিল একই রকম আতঙ্ক ও ভয়।

কিন্তু যারা দ্বীনে-হক্ক ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হলে পলায়ন না করে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দান ভরে উঠে তাদের লাশে, কিন্তু তারা পিছু হটে না। কে হকের পথে আছে আর কে নেই, তা সৈনিকদের চোখের দিকে তাকালেই বুঝা যায়।'

'তোমাকে সুলতান আইয়ুবীর সমর্থক মনে হচ্ছে!' সাইফুদ্দিন এমন স্বরে কথা বললো, যাতে একই সাথে বিস্ময় ও রাগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, 'তবে তো তোমার ওপর বিশ্বাস করা যায় না!'

ইতিমধ্যে একটি কিশোরী মেয়ে খাবার নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। তার পিছন পিছন এলো এক যুবতী, তার হাতেও খাবারের থালা। সাইফুদ্দিনের দৃষ্টি কিশোরী মেয়েটার ওপর নিবদ্ধ হলো। খাবার রেখে চলে গেল তারা, সাইফুদ্দিন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়ে দু'টি কে?'

'ছোটটা আমার মেয়ে।' বৃদ্ধ বললো, 'আর বড়টা আমার পুত্র বধূ। আমার যে ছেলে আপনার সেনাবাহিনীতে আছে তার বেগম। যখনি আমার বউমার দিকে তাকাই, কেন যেন মনে হয়, আমার বউ মা বিধবা হয়ে গেছে।'

'তোমার ছেলে এ যুদ্ধে মারা গিয়ে থাকলে আমি তোমাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করবো।' সাইফুদ্দিন বললো, 'আর তোমার ওই মেয়ের জন্যও কোন চিন্তা করো না। তাকে কোন গরীবের ঘরে বউ হয়ে যেতে হবে না। আমি তাকে নিয়ে যাবো আমার মহলে। সেখানে সে

রাজরানীর মর্যাদায় থাকবে।'

'আমি আমার ছেলেকে কারো কাছে বিক্রি করিনি, আর মেয়েকেও কারো কাছে বিক্রি করার ইচ্ছে নেই।' বৃদ্ধ বললো, 'পর্ণকুটিরে বড় হওয়া মেয়ে কোন সিপাহীর পর্ণকুটিরেই মানাবে ভাল। আমি আর একবার আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি আমাকে আর লোভ দেখাবেন না। আপনি এখন আমার মেহমান! আপনার সমস্ত রকমের খেদমতের ব্যবস্থা করা আমার দায়িত্ব। আমি তাতে কোনরকম ত্রুটি করবো না।'

'থাক, এসব নিয়ে তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। যাও, তুমি শুয়ে পড়োগে!' সাইফুদ্দিন বৃদ্ধকে বললো, 'তোমার ওপর বিশ্বাস ও ভরসা করা যায়। তোমার প্রতি আমি এজন্য খুশী যে, আমার রাজ্যে তোমার মত সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী নীতিবান লোক এখনও বেঁচে আছে।'

বৃদ্ধ সেখান থেকে চলে গেল। সাইফুদ্দিন তার সঙ্গীদের বললো, 'এ ধরনের লোক কখনো ধোঁকা দিতে পারে না। তোমরা এর কন্যাকে দেখেছো, কি ফুলের মত সুন্দর!'

'একদম খাঁটি মোতি!' সহকারী সেনাপতি বললো।

'এদের অবস্থা একটু ভাল হলে তবে এ মোতি সুন্দর ঝুড়িতে পড়বে।' সাইফুদ্দিন হেসে সহকারী সেনাপতিকে বললো, 'তুমি মুশেলের সংবাদ নাও, সৈন্যদের একত্রিত করো। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তৎপরতার খবর নাও। আমাকে অতিসত্তর জানাও, আমি মুশেলে আসবো, নাকি আরো

কিছুদিন অপেক্ষা করবো।' এরপর কমাণ্ডারের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি হলবে যাও। ওদের বলবে, আমি নিরাপদ ও সুস্থ আছি।'

সাইফুদ্দিনকে সে বাড়ীতে রেখে রাতের অন্ধকারেই দু'জনে যাত্রা করলো সেখান থেকে। আমীর সাইফুদ্দিন একা রয়ে গেলো সে বাড়ীতে। শরাবে বিভোর হয়ে সুন্দরী মেয়েদের পাশে নিয়ে মহলে জীবন কাটনো যার অভ্যাস, সেই সাইফুদ্দিন এখন এক কাঁচা বাড়ীর পর্ণকুটিরে মেঝের বিছানায় এলিয়ে দিল তার ক্লান্ত দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রা এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

এর ঠিক একদিন আগের ঘটনা। যুদ্ধের ময়দান থেকে এক সৈন্য পালিয়ে মুশেলের দিকে যাচ্ছিল। সে ঘোড়া ছুটালো এবং এক সময় ঘোড়া থামিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা বা দেখছে কিনা। যখন নিশ্চিত হলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, তখন সে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। কখনো ঘোড়া থামিয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিতো। সে চলাচলের রাস্তা থেকে একটু দূর দিয়ে যাচ্ছিল। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল, ভয় ও আতংক তার বুদ্ধি বিবেক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঠিকমত কাজ করছে না মাথা।

এক জায়গায় সে ঘোড়া থামালো। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এলো। তারপর কেবলামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। নামাজ শেষে দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে

অঝোর ধারায় কেঁদে বুক ভাসালো। মোনাজাত শেষ হলেও সে সেখান থেকে উঠলো না, সেখানেই দুই হাটুর মধ্যে মাথা লুকিয়ে বসে রইলো। এ লোক ছিল সুলতান সাইফুদ্দিন গাজীর এক সৈনিক।

পরাজিত সৈন্যরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছিল, সে সময় সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা তাদের মধ্যে মিশে গেল। সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দা সংস্থাকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, শত্রুরা যখন পিছু হটে পালাতে থাকবে, তখন কিছু সংখ্যক সাহসী কমাণ্ডো যেন বেশ বদল করে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। শত্রু এলাকায় গিয়ে তাদের গতিবিধি, কার্যকলাপ, সৈন্য গঠনের খবরা-খবর সংগ্রহ করে এবং সময় সুযোগ করে তা সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

দামেশক থেকে যখন আল মালেকুস সালেহ সৈন্য নিয়ে পালিয়েছিল, সে দলের সাথেও কিছু গোয়েন্দা পালিয়ে তাদের সাথে হলব শহরে প্রবেশ করেছিল।

এ কথা আগেও বলা হয়েছে, সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধের সাফল্যের পেছনে এ গোয়েন্দা বিভাগের অবদান ও ভূমিকা ছিল সরাসরি লড়াইয়ের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই গোয়েন্দা বিভাগের লোক নির্বাচনের সময় অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ধীর মস্তিষ্কের লোকদের প্রতি অধিক নজর দেয়া হতো। এরা যে কোন সমস্যায় ত্বরিত সমাধানের যোগ্যতা রাখতো। ক্ষিপ্র গতি ও অস্ত্র চালনায় অসম্ভব দক্ষতা ছিল এদের বৈশিষ্ট্য।

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাসে সুলতান আইয়ুবী যখন সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে হলবের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর গোয়েন্দা প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দারা তখন বিচ্ছিন্ন শত্রু সেনাদের সাথে মিশে হলব, মুশেল ও হারান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। শত্রুদের পরবর্তী প্ল্যান ও তৎপরতার তথ্য সরবরাহের জন্য তারা ছিল যে কোন ধরনের ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত।

এদের অনেকে ছিল শত্রুদের পোষাকে, কেউ কেউ গ্রাম্য সাধারণ লোকের বেশে। তাদের সেখানে অবস্থান করা ছিল খুবই জরুরী, কেননা শত্রুর পরবর্তী আক্রমণের পরিকল্পনা ও তৎপরতার আলোকেই সুলতান আইয়ুবীকেও তার পরিকল্পনা সাজাতে হবে।

সুলতান আইয়ুবী শত্রুদের যে ক্ষতি করেছিল তাতে তাদের ধারণা ছিল, শত্রুদের পুনর্গঠিত হতে অনেক সময় লাগবে। শত্রুদের যে তিনটি দল ছিল, সুলতান আইয়ুবী ভালভাবেই জানতেন, এ তিন দলের মধ্যে আন্তরিকতা ও মিল নেই। এ তিন দলের প্রত্যেক দলনেতারই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, আইয়ুবীকে পরাজিত করে ইসলামী সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতার মালিক নিজে হওয়া। তারা মনে মনে একে অন্যের বিরুদ্ধে থাকলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে সুলতান আইয়ুবী তাদের সকলেরই প্রধান শত্রু ছিলেন। এ জন্যই তাদের একত্রিত হওয়া ও এক কমাণ্ডে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। গোয়েন্দারা খবর নিয়ে নিশ্চিত হলো, পরবর্তীতেও ঐক্যবদ্ধ কমাণ্ডেই যুদ্ধ

চালানোর পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।
তবুও সুলতান আইয়ুবী বেশ ভাল মতই বুঝতেন, এমন বিলাসপরায়ণ ও আরামপ্রিয় আমীররা যুদ্ধের ময়দানে অধিক সময় টিকে থাকতে পারবে না। তিনি একথাও বুঝতেন, এ আরাম প্রিয় আমীদের উস্কে দেয়া এবং তাদের পরিপূর্ণ মদদ ও সাহায্য-সহযোগিতা খৃস্টানরাই দিয়ে যাচ্ছে। এসব আমীরদের পাশে খৃস্টানদের উপদেষ্টা সব সময় আছে এবং তারাই যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা তৈরী করে দিচ্ছে।
তবে বিপথগামী মুসলমান সেনাপতিদের মধ্যেও এমন দু'চারজন আছে, যারা নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখে। তাদের মধ্যে মুজাফফর ইবনে জয়নুদ্দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ লোক সুলতান আইয়ুবীর অধীনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। ফলে সুলতান আইয়ুবীর রণ কৌশল ও যুদ্ধের চাল তার ভাল করেই জানা আছে। খৃস্টান উপদেষ্টারা মুজাফফর উদ্দিনের মত যোগ্য সেনাপতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত এবং তাকে দিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে সব সময় বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করে রাখতে চাইতো।
সুলতান আইয়ুবীকে যে চিন্তা সবচেয়ে বেশী পেরেশান করে রেখেছিল, সেটি হলো, তাঁর রণক্লান্ত সেনাবাহিনী! আল্লাহর সাহায্যের পর এ সেনাবাহিনীই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ও অবলম্বন! এমন প্রলয়ংকরী ও ব্যাপক যুদ্ধের পর তাদের সামান্য বিশ্রাম ও বিরতি না দিয়ে আবারো ব্যাপক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া তিনি যৌক্তিক মনে করতে পারছিলেন না।

আবার বিরতি দিলে দুশমনের সংগঠিত হওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাও আইয়ুবীর জন্য কেবল বিপদই বাড়াবে। এ অবস্থায় কি করবেন তাই ভাবছিলেন তিনি।

বিগত যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা একেবারে নগন্য ছিল না! যদিও শত্রুদের তিনি পরাজিত করতে পেরেছেন, কিন্তু তার মূল্যও কম দিতে হয়নি। সুলতান আইয়ুবীর জন্য আরো একটি অসুবিধা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, তিনি বহুদিন যাবত রাজধানী থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন। খাদ্য ও রসদপত্র সাথে থাকলেও দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালাতে গিয়ে রসদপত্রও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

এসব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি দ্রুত নিকটবর্তী এলাকা থেকে সৈন্য ভর্তি শুরু করে দিলেন। নতুন সৈন্যদের মধ্যে তলোয়ার চালানো, তীর চালানো ও অশ্বারোহণের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। সেই সাথে তাদের মধ্যে নতুন প্রেরণা এবং জেহাদী জযবা জাগানোর প্রশিক্ষণও শুরু হলো।

আইয়ুবীর তখন অনেক ব্যস্ততা। নতুন সেনা ভর্তি ও তাদের প্রশিক্ষণের কাজে একদলকে নিয়োজিত করে অন্যদের নিয়ে তিনি বিজিত এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকে মনযোগ দিলেন। সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের ফলে এমন অনেক এলাকা বিনা যুদ্ধে ও প্রতিরোধহীন অবস্থায় করায়ত্ব হয়েছিল, যে সব অঞ্চলে ফৌজি চৌকি স্থাপন করে তাকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। তিনি পরগণার পর পরগণা অতিক্রম করে সেসব অঞ্চলে

নিজের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চললেন।
এভাবে যেতে যেতে শেষে তিনি এমন এক এলাকায় পৌছে গেলেন, যেখানে দুর-দূরান্ত পর্যন্ত শস্য শ্যামল সবুজ প্রান্তরের অবারিত সৌন্দর্য খেলা করছিল। এই সবুজের সমারোহ সম্ভব হয়েছিল এখানে পানির অজস্র উৎসধারা থাকায়।
ছুটতে ছুটতে সেনাবাহিনী ও তাদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। উট ও ঘোড়াগুলো সামনে এত ঘাস-পানি দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল!
এ অপরূপ সৌন্দর্যের সুষমা দেখে সুলতান আইয়ুবীর চোখ জুড়িয়ে গেল। এখানেই ক্যাম্প করার আদেশ দিলেন তিনি।
ক্যাম্প করা হলো। ক্যাম্পের দেখাশোনা ও পাহারার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো বাহিনীর একদল সেনা সদস্যকে। গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোরা ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশে, চারদিকে। তাদের আদেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না, তাদের কাজ চলছিল আপন গতিতে। এই সে স্থান, যে তুর্কমানে সুলতান আইয়ুবী ক্যাম্প করেছিলেন বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ণ নাম হুব্বাবুত তুর্কমান, অর্থাৎ ঝর্ণাস্নাত তুর্কমান।
এ ক্যাম্পে অবস্থানকালেই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আল মালেকুস সালেহ তার প্রতারণামূলক সন্ধিপত্র পাঠিয়েছিল। তিন চার দিন পর এক গোয়েন্দা মারফত সাইফুদ্দিন গাজীকে লেখা আল মালেকুস সালেহের পত্র থেকে সুলতান এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছিলেন।
সুলতান আইয়ুবীকে এ চিঠি খুবই বিচলিত করেছিল ঠিকই,

কিন্তু বিচলিত হয়েও হুট করে কোন অভিযান চালানোর মত অদূরদর্শী সেনাপতি তিনি ছিলেন না। কারণ শত্রুদের মত তারও সেনাবাহিনীকে নতুন করে সাজানোর প্রয়োজন ছিল।

এ ক্যাম্পে বসেই সুলতান আইয়ুবী সেনা অফিসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সেনা ভর্তি দ্রুত করো! ওদেরকে সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোল। এ কাজ খুব দ্রুত সারতে হবে তোমাদের। আল্লাহ তোমাদের বড় দয়া করেছেন, তিনি তোমাদেরকে এমন শত্রুর সামনে দাঁড় করিয়েছেন, যারা বোকা ও বুজদিল। যদি শত্রুরা হুশিয়ার ও বিচক্ষণ হতো, তবে এ পরাজয়ের পর দ্রুত পেছনে সরে ওরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু এমন হিম্মতওয়ালা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের অভাবে কার্যকর সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে সময় লাগবে তাদের।

এ জায়গাটিকে আমার মনে হয় এক জান্নাতের টুকরো। যেমন এর প্রাকৃতিক সুষমা তেমনি অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ এর ভাণ্ডার। ঘোড়া ও উটগুলোর জন্য এমন আদর্শ জায়গা সহজে পাওয়া যায় না! এখানে আমাদের যুদ্ধের পশুগুলো তৃপ্ত হয়ে ঘাস পানি খেয়ে শক্তি লাভ করবে। পরে যদি দশদিনও আহার পানি না পায় তবুও লড়ে যেতে পারবে। বন্ধুগণ! শত্রুকে ছোট ভাববে না! সৈনিকদের বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রেখো, কিন্তু অলস হতে দিও না। ডাক্তারদের বলবে, তারা যেন রাতে না ঘুমায়। আহত ও অসুস্থদের অতি শীঘ্র সুস্থ করে তোল। রুগীদের সেবা-শুশ্রূষা ও যত্ন যেন রাতদিন

একই গতিতে চলে।'

তিনি অফিসারদের উদ্দেশ্যে আরো বললেন, 'মনে রেখো, আমাদের শত্রু আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা নয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধরতে হচ্ছে, কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে থাকতে হবে মহব্বত ও দরদ। তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য, হত্যা করা নয়। তাদেরকে তিরস্কার করা, গালমন্দ করা বা বিতাড়িত করা তোমাদের কাজ নয়!

দুশমন আমাদের ক্রুসেডাররা, খৃস্টান ও ইহুদীরা। টার্গেট আমাদের ফিলিস্তিন! পথে বসে আপোষে চুল টানাটানি ও ঝগড়া করে সময় ক্ষেপন করলে তাতে দুশমনেরই লাভ। এভাবে যতক্ষণ ওরা আমাদের ব্যস্ত রাখতে পারবে তাতে তাদের উদ্দেশ্যই সফল হবে। এসব উটকো ঝামেলাকে মনে করবে গায়ে পড়া মশা-মাছি। চলতি পথে ওরা এসে গায়ে বসলে হাত চালিয়ে ওদের মারবে ঠিকই, কিন্তু গন্তব্যের পথে ছুটে চলা বন্ধ করে পথের মশা মেরে দিন কাটিয়ে দেয়া চলবে না।

গন্তব্য তোমাদের ফিলিস্তিন। বুকের ভেতর প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসার জ্বলজ্বলে ছবি। পথের সমস্ত বাঁধা মাড়িয়ে ফিলিস্তিনের মাটিতে পা রাখতে হবে তোমাদের। তোমাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ রেখো। ডানে বায়ে তাকানোর পরিবর্তে অগ্রসর হও ফিলিস্তিনের পথে। যদি রাস্তায় কাঁটাঝোপে আটকে পড়ে গায়ের জামা, সে জামা খুলে নেয়ার পরিবর্তে

ছিঁড়েখুঁড়ে এগিয়ে যাবে। মুজাহিদের কাছে উদ্দেশ্য হাসিলের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই, থাকতে পারে না।'

যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছিল সম্মিলিত বাহিনীর সেনা সদস্যরা। সাইফুদ্দিন গাজীর সেনাবাহিনীর এক সিপাই একাকী পথ চলছে। সে যাচ্ছিল মুশেলের দিকে, চোখে মুখে ভয় ও আতংকের ছাপ স্পষ্ট। এ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই সমরক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে। তারা একাকী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যার যার আশ্রয়ে ছুটে যাচ্ছে প্রাণপণে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ সৈনিক একাকী পালাচ্ছিল, খুঁজছিল কোন নিরাপদ আশ্রয়।
সে ছিল খুবই পেরেশান ও ক্লান্ত। সে রাস্তার এক স্থানে ঘোড়া থামিয়ে নামাজ আদায় করলো। নামাজ শেষে হাত উঠিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরিয়ে দোয়া করলো আল্লাহর দরবারে। তখনো তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। দোয়া শেষ হলেও সে সেখান থেকে উঠলো না, সেখানেই মাথা দু'হাটুর মধ্যে গুঁজে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে রইলো।
আরেক অশ্বারোহী এসে থেমে গেল তার পাশে। সিপাইটি চিন্তায় এমনই মগ্ন ছিল, ঘোড়ার পদধ্বনিতেও ধ্যান ভাঙলো না তার। আরোহী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামলো এবং এগিয়ে গিয়ে সিপাহীর কাঁধে হাত রাখলো। আঁৎকে উঠে মাথা তুলে তাকালো সিপাহী।
'আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, তুমি যুদ্ধের ময়দান

থেকে পালিয়ে এসেছো।' আরোহী তার পাশে বসে বললো, 'কিন্তু তুমি এমনভাবে বসে আছো কেন? তুমি কি আহত! বলো তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

'আমার শরীরে কোন ক্ষত বা জখম নেই।' সিপাহী বুকে হাত রেখে বললো, 'জখম আমার এই হৃদয়ের গভীরে। এ ক্ষত থেকে যে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে তা আমি তোমাকে কেমন করে দেখাবো!'

যে অশ্বারোহী শান্তভাবে তার পাশে বসেছিল, সে ছিল সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা। পলায়নপর দুশমনের সাথে মিশে শত্রু এলাকায় যাওয়ার জন্য ময়দান থেকে বের হয়ে এসেছিল সে। এ যুবকের নাম দাউদ! ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোয়েন্দা বিধায় সে সিপাহীকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বুঝে ছিল, একে কাজে লাগানো যাবে। সে বুঝতে পেরেছিল, ভীতি ও আতংকের চাইতে আবেগ ও লজ্জা তাকে আহত করেছে বেশী। আর এ মর্মাহত হওয়ার পিছনে কাজ করছে পরাজয়ের গ্লানি। দাউদ সিপাহীর সাথে এমন দরদভরা কণ্ঠে কথা বললো, সিপাহী মনের কথা বলার জন্য একজন দরদী মানুষ পেয়ে মনের সব আবেগ ঢেলে দিল তার সামনে।

'যুদ্ধ করা আমার বংশগত পেশা।' সিপাইটি বললো, 'আমার বাবা সৈনিক ছিলেন, দাদাও সৈনিক ছিলেন। সৈনিক পেশা যেমন আমাদের জীবিকার্জনের পথ তেমনি এটাই আমাদের আত্মারও খোরাক। কিন্তু আমার বাপ-দাদারা যুদ্ধ করেছে আল্লাহর সৈনিক হিসাবে! ইসলামের জন্য, ধর্ম ও জাতির

জন্য। আমি কার জন্য যুদ্ধ করছি? আমি জানি, খৃস্টানরা আমাদের জঘন্যতম শত্রু। তারা আমাদের জাতির শত্রু। আমি এটাও জানি, আমাদের প্রথম কেবলা এখন খৃস্টানদের অধিকারে। আমার বাবা আমাদের শত্রু কে আর বন্ধু কে তা ছোটবেলা থেকেই গল্প করে জানিয়েছেন আমাকে। শুনিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রাম ও যুদ্ধের অনেক ইতিহাস। আমিও ইসলামের জন্যই সেনা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। দেশ ও জাতির হেফাজতের মহান আদর্শ ছিল আমার সামনে। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর আমাদের বলা হলো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টানদের বন্ধু ও চরিত্রহীন লোক। তার আগে আমরা জানতাম, সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। জানতাম, খৃস্টানরা তাকে ভীষণ ভয় পায়। কারণ তিনি মুসলমানদের প্রথম কেবলা খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সংকল্প করেছেন। কিন্তু এখন শুনলাম নতুন কথা। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অনেক খারাপ মন্তব্য করে আমাদের মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলো। আমরা আমাদের সুলতান সাইফুদ্দিন গাজীকে সঠিক মনে করতাম। ভাবতাম, পিতার মত তিনিও ইসলামের একজন সেবক।

একদিন আমাদের বাহিনীকে অভিযান চালানোর আদেশ দেয়া হলো। আমরা যুদ্ধের জন্য অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর একদিন শত্রুর মুখোমুখি হলাম। যুদ্ধ চলাকালে আমরা জানতে পারলাম, আমরা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করছি, লড়াই করছি সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে।

আমি যখন আইয়ুবীর বাহিনীর মুখোমুখি হলাম, তখন শুনতে পেলাম তাদের ঘোষণা। আইয়ুবীর সৈন্যরা চিৎকার করে বলছিল, 'হে মুসলমান সৈন্যরা! সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তোমাদের পয়দা করেননি। তোমাদের শত্রু খৃস্টানরা, আমরা নই! তোমরা আমাদের ভাই। এসো, আমাদের সঙ্গী হও। আমাদের প্রথম কেবলা মুক্ত করার জন্য এসো আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করি। বিলাসপ্রিয় নেশাগ্রস্থ শাসকদের পক্ষে যুদ্ধ করো না। ওরা খৃস্টানদের তল্পীবাহক হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।' আমি তাদের পতাকা দেখেছি, পতাকার ওপর কালেমা তৈয়ব লিখা আছে। ওরে ভাই, আমি তাদের যে জযবা ও আবেগ নিয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি, তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহ তাদের সাথেই রয়েছেন, আল্লাহই তাদের সাহায্যকারী। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, আমরা এক অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি। কোত্থেকে তীর ছুটে আসছে, কারা মারছে, কোত্থেকে ছুটে আসছে আগুনের শিখা, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

এক স্থানে উপত্যকা দু'ভাগে ভাগ হয়ে ছিল। তার কাছেই ছিলাম আমি। আমার মনে মৃত্যুর ভয় নয়, আল্লাহর ভয় ঢুকে গেল। মনে হলো আমি ভুল পথে আছি। এ ভাবনা মনে জাগতেই আমার বাহু শক্তিহীন হয়ে পড়লো। তলোয়ার ধরে রাখি এমন শক্তিও পাচ্ছিলাম না হাতে। ঘোড়ার লাগাম

টানারও শক্তি ছিল না। আমি ঘোড়া নিয়ে সে উপত্যকার ফাঁকের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। আমি কাপুরুষ ছিলাম না, তবুও আমার শরীর কাঁপছিল। বাইরে তলোয়ারের সাথে তলোয়ারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হচ্ছিল। ঘোড়ার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আর আমার কানে সেই ধ্বনি ভেসে আসছিল, 'এই পবিত্র রমজান মাসে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না.........'। আমার মনে পড়ে গেল আমাদের ইমামের ফতোয়া। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, যুদ্ধের সময় রোজা মাফ আছে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর সেনারা সবাই ছিল রোজাদার! তাহলে আমরা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছি!

আমি ততক্ষণে প্রতিপক্ষের তিনজন সৈনিককে হত্যা করে ফেলেছিলাম। তাদের রক্তের ছাপ লেগে আছে আমার তলোয়ারে। সৈনিকরা তলোয়ারে শত্রু সেনার রক্ত দেখে গর্ব অনুভব করে, কিন্তু আমি আমার তলোয়ারের দিকে তাকাতেও ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ আমার তলোয়ারে লেগে আছে আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্ত! আমি যুদ্ধ করার সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেললাম। ময়দানে না গিয়ে আমি সেখানেই লুকিয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক সৈন্য আমাকে দেখে ফেললো। সে হুংকার দিয়ে আমার সামনে এসে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করলো এবং আমার দিকে বর্শা তাক করে মারতে প্রস্তুত হলো। আমি আমার রক্তাক্ত তলোয়ার তার ঘোড়ার পায়ের তলে ছুঁড়ে ফেললাম এবং বললাম, 'আমি তোমার এক

মুসলমান ভাই, আমি যুদ্ধ করবো না।'

দূরে তখনো ভীষণ যুদ্ধ চলছে। এ সৈন্যটি সম্ভবত কমাণ্ডো বাহিনীর ছিল। সে এখানে ওখানে লুকানো সৈন্যদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি বুঝতে পারছো, তোমরা আল্লাহর খাস বান্দাদের সাথে লড়াই করতে নেমেছো?'

আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে বললাম, 'এ পাপ আমাদের দিয়ে করানো হচ্ছে। মিথ্যা ও ভুল বুঝিয়ে আমাদের পথভ্রষ্ট করা হয়েছে।'

সে আমার কাছ থেকে বর্শা নিয়ে নিল, তলোয়ার তো আগেই ফেলে দিয়েছিলাম। সে একদিকে ইশারা করে বললো, 'আল্লাহর কাছে তোমার গোনাহের ক্ষমা চাও আর এই পথ ধরে চলে যাও। পিছনে তাকাবে না, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম।'

আমার চোখে অশ্রু এসে গেল, যুদ্ধের ময়দানে কেউ কখনো প্রতিপক্ষের প্রাণ ভিক্ষা দেয় না। আমি ঘোড়া একটু ফাঁকে নিয়ে তাড়া করলাম আর সে যে রাস্তা বলেছিল সে রাস্তা ধরে ময়দান থেকে সরে এলাম। রাস্তাটি সত্যি নিরাপদ ছিল।

অবশেষে যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে চলে এলাম। রাতে একস্থানে বিশ্রামের জন্য থামলাম এবং শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে সেই তিন শহীদের চেহারা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে, যাদেরকে আমি যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছিলাম। তাদের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তারা আমার

পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। তাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, তারা আমাকে কিছু বলছিলও না। কেবল হাঁটছিল আর নীরবে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। আমি এতই ভয় পেলাম যে, ভয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আমি শিশুর মত কান্না শুরু করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল!

রাতে খোলা আকাশের নিচে শীতের তীব্রতা ছিল প্রচণ্ড। ঘুম ভাঙতেই আমি টের পেলাম, আমার শরীর থেকে দরদর করে ঘাম বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বসলাম এবং একটু ধাতস্থ হবার পর আমি আল্লাহর কাছে পাপ ও অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নফল নামাজ পড়ে কান্নাকাতর কণ্ঠে দোয়া করলাম।

আমি তিন চার দিন এভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। দিনের বেলাতেও শান্তিতে থাকতে পারি না। একটু ঘুম এলেই স্বপ্নে আমার হাতে নিহত ওই তিন শহীদ আমাকে ঘিরে ধরে। দিনের বেলা চলার পথেও আমার মনে হতো, তারা যেন আমাকে আশপাশের ঝোঁপঝাড় ও জঙ্গলের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে।

যদি আইয়ুবীর সেই কমাণ্ডো, যে আমাকে গোপন স্থানে খুঁজে পেয়েছিল, হত্যা করতো, তবে এ বিপদ থেকে আমি নিস্তার পেয়ে যেতাম। সে আমার জীবন ভিক্ষা দিয়ে আমাকে আরো বিপদে ফেলে দিয়েছে। একেক সময় মনে হয়, সুযোগ থাকলে আমার জান আমি নিজেই বের করে দিতাম। হায়! আমি প্রিয় নবী (সা.)-এর তিনজন মুজাহিদকে হত্যা করে ফেলেছি! এখন আমার কি হবে!’

সে আগন্তুকের হাত আকড়ে ধরে বললো, 'তুমি আমার উপকার করতে চেয়েছো, আমাকে খুন করে তুমি কি আমাকে এ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেবে?'

'না, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে!' দাউদ বললো, 'তুমি যে মারা যাওনি, এটা আল্লাহরই ইচ্ছা! আল্লাহর ফয়সালা ছিল বলেই তুমি যুদ্ধের ময়দান থেকে তুমি জীবিত ফিরে আসতে পেরেছো! এখন দগ্ধ হচ্ছো সীমাহীন অনুশোচনায়! এতে এটাই প্রমাণ হয়, আল্লাহ্ তোমার দ্বারা কোন মহৎ কাজ সমাধা করাবেন। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করার জন্যই হয়তো আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আত্মহত্যা নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্য করার সে সুযোগকে গ্রহণ করাই হবে এখন তোমার কাজ।'

'তাহলে তুমি আমাকে বলো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে যে সব খারাপ ও উদ্ভট কথা আমাদের শোনানো হয়েছে, তা সব মিথ্যা!'

'হ্যাঁ, সবই ডাহা মিথ্যা কথা!' দাউদ উত্তর দিল, 'এসব শাসকদের সাথে তার বিবাদের কারণ শুধু এটাই, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টানদের বিতাড়িত করে এখানে আল্লাহর শাসন কায়েম করতে চান, আর তারা খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায়। খৃস্টানদের নির্দেশেই তারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে।'

দাউদ তাকে জানালো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কি আশা পোষণ

করেন। কেন তিনি সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যদের হাতের নাগালে পেয়েও তাদের হত্যা না করার নির্দেশ দিয়েছেন নিজের সৈন্যদের। মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিনের প্রসঙ্গ এলে দাউদ তাকে বললো, 'তিনি এতই বিলাসপ্রিয় যে, যুদ্ধের ময়দানেও তিনি মদ, মেয়ে আর পোষা পাখি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।'

'এখন আমাকে বলো, আমি কিভাবে ওই তিন মুজাহিদের রক্তের মূল্য পরিশোধ করবো।' সে দাউদকে বললো, 'যদি এ বোঝা আমার মন থেকে হালকা না হয়, তবে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না। যদি আমাকে বলো, মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিনকে হত্যা করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হবে, তবে আমি তাকে খুন করতেও রাজি।'

'প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ তুমি অনেক পাবে।' দাউদ বললো, 'এর জন্য প্রয়োজন মনকে সুস্থির করা। এ অস্থিরতা নিয়ে তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এ জন্য সময়ের প্রয়োজন। সময় এলে আমি তোমাকে বলে দিতে পারবো, কি করলে তোমার পাপের কাফফারা আদায় হবে।'

'তুমি কি ততক্ষণ আমাকে তোমার সঙ্গে রাখতে রাজি হবে?'

'মনে হয় আমরা একই পথের পথিক। ক্ষতি কি চলার পথে একজন বন্ধু পেলে। আমি মুশেল যাবো।' দাউদ নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমি সেখানকার বাসিন্দা। যুদ্ধ চলছে, এ অবস্থায় কোত্থেকে কি বিপদ এসে পড়ে সেই ভয়ে সদর রাস্তা ছেড়ে আমি এ পথ ধরেছি। ভাল কথা, আমি তো

তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি, তুমি কে, কোত্থেকে এসেছো, কোথায় যাচ্ছো? তোমার পরিচয়ই তো এখনো জানা হলো না।'

'আমার নাম হারেস। আমার গ্রাম এখান থেকে বেশী দূরে নেই।' হারেস উত্তরে বললো, 'মুশেল এখনো অনেক দূর। তোমার পথেই পড়বে আমাদের গ্রাম। কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তুমি আমাদের বাড়ীতে থামতে না চাইলেও আমি তোমাকে থামতে বাধ্য করবো। তুমি আমার আহত মনে শান্তি দিয়েছো, জীবনে সবচে বড় বন্ধুর কাজ করেছো। আমি এমন সত্য ও সরল কথা কখনো শুনিনি। আমি মুশেলের সেনাবাহিনীতে আর কখনো যোগ দেবো না। আশা করি তুমি আমাকে মুক্তির পথ দেখাবে।'

'হেদায়াতের পথ দেখানোর মালিক আল্লাহ। তিনি কাউকে সত্য সঠিক পথ দেখাতে চাইলে কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। এখন আর কথা নয়, চলো রওনা করা যাক।'

সেই সিপাহী উঠতে উঠতে বললো, 'চলো।'

তারা দু'জন ঘোড়ায় চেপে বসলো। ঘোড়া এগিয়ে চললো হারেসের বাড়ীর দিকে।

মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিন গাজী বৃদ্ধের পর্ণকুটিরে মেঝের বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় ডুবে ছিল। গত কয়েক রাত আতংকে তাকে নির্ঘুম কাটাতে হয়েছে। আজ একটু নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত হয়ে এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে, ঘরের দরজায় এসে ওরা যখন টোকা দিল, তখনও তার ঘুম ভাঙল

না।

রাত অর্ধেকের বেশী পার হয়ে গেছে। মধ্য রাতে একবার ঘুম থেকে উঠতে হয়েছিল সাইফুদ্দিনের জন্য, অনেক রাতে আবার ঘুমিয়েছে বাড়ীর লোকজন, তাই ঘুম ভাঙতে সময় লাগলো ওদের। উপর্যুপরি দরজায় করাঘাত শুনে প্রথমেই ঘুম ভাঙলো বৃদ্ধের। চোখ খুলে বিছানায় উঠে বসলো বৃদ্ধ। তার মেয়ে এবং পুত্র বধুও জেগে উঠলো। বৃদ্ধ বিরক্তির স্বরে বললো, 'মনে হচ্ছে সুলতান আইয়ুবীর তাড়া খেয়ে আবার কোন সৈন্য বা কমাণ্ডার এসেছে। রাস্তার পাশে বাড়ী হওয়ার এই এক বিপদ!'

বৃদ্ধ উঠে গিয়ে দরজা খুললো। দেখলো, বাইরের অন্ধকারে দুই অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলতেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এলো হারেস। বাবাকে সালাম করে বললো, 'আব্বা, আপনারা সবাই ভাল আছেন?'

বৃদ্ধ এগিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো পুত্রকে। বললো, 'বেটা! আমরা ভাল আছি। আমি খুব খুশী হয়েছি, তুমি অবৈধ মৃত্যুর কবল থেকে সরে আসতে পেরেছো। নইলে যতদিন আমি বেঁচে থাকতাম, লোকজন আমাকে বলতো, 'তোমার ছেলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।'

বৃদ্ধ তার ছেলের বন্ধু দাউদের সাথেও মুসাফেহা করলো।

দাউদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, বৃদ্ধ তার ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে ফিসফিস করে বললো, 'তোমাদের প্রধান সেনাপতি আমীর সাইফুদ্দিন গাজী পাশের কামরায় ঘুমিয়ে আছেন।

ঘোড়া বেঁধে রেখে তোমরা সন্তর্পনে ভেতরে চলে আসো।'

'সাইফুদ্দিন গাজী!' হারেস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তিনি কেমন করে এখানে এলেন?'

'পরাজিত হয়ে পালাতে গিয়ে এখানে চলে এসেছেন!' বৃদ্ধ চুপি চুপি বললো, 'তোমরা ভেতরে চলো।'

ঘোড়া বেঁধে রেখে হারেস দাউদকে নিয়ে তার নিজের কামরায় গেল। বৃদ্ধ ছাড়াও সেখানে বসেছিল তার বোন ও স্ত্রী। সে দাউদকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার এ বন্ধুর নাম দাউদ! এর চেয়ে উত্তম বন্ধু আর কেউ হতে পারে না।'

'তুমিও কি পালিয়ে এসেছো?' বৃদ্ধ দাউদকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি সৈনিক নই।' দাউদ উত্তরে বললো, 'আমি মুশেল যাচ্ছি। যুদ্ধ আমাকে এ পথে আসতে বাধ্য করলো। পথে হারেসকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে গেলাম আর তার সাথে এখানে চলে এলাম।'

'বাবা, আমাকে বলো মুশেলের আমীর এখানে কেন?' হারেস তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো।

বৃদ্ধ ওদের জানালো কেমন করে তিনি এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। বললো, 'আজই মধ্য রাতে তিনি এখানে এসেছেন। তার সাথে তার সহকারী সেনাপতি ও একজন কমাণ্ডার এসেছিল। তিনি তাদের দু'জনকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তাদের কোথায় পাঠিয়েছেন কিছুই শোনেননি আপনি?'

'আমার কানে শুধু এ শব্দটুকুই ঢুকেছিল, 'সৈন্যদের একত্রিত করো। আর আমাকে জানাও, আমি মুশেল চলে আসবো, না কি আরো কিছুদিন লুকিয়ে থাকবো।' আমি তখন দরজার কাছেই ছিলাম।'

'আপনার কি মনে হয়, তিনি মুশেলের সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে আবার যুদ্ধে যেতে চাচ্ছেন?' দাউদ জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ। যদিও এখন তিনি ভয়ের মধ্যে আছেন, আমাকে বলেছেন কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে তিনি এখানে আছেন। তবু তার চিন্তা-চেতনায় কোন পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয়নি আমার।' বৃদ্ধ বললো, 'আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প তার অবশ্যই আছে। তিনি সহকারী সেনাপতিকে মুশেল পাঠালেও তার কমাণ্ডারকে মুশেল নয়, অন্য কোথাও পাঠিয়েছেন।'

'আমি তাকে খুন করবো।' হারেস বললো, 'তিনি মুসলিম মিল্লাতকে বিভক্ত করে দিয়েছেন। মুসলমান সৈনিকদেরকে লেলিয়ে দিয়েছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন। খৃস্টানদের খুশী করতে স্বজাতির রক্তে রঙিন করেছেন নিজের হাত। আমি তাকে খুন করবো।' প্রচণ্ড রাগ ঠিকরে পড়ছিল তার চেহারা থেকে। দেয়ালের সাথে তার পিতার তলোয়ার লটকানো ছিল, সে সেটি খপ করে হাতে নিল। বৃদ্ধ পিতা পিছন থেকে চেপে ধরলো তাকে। দাউদ ছুটে

গিয়ে তার হাত চেপে ধরে ছিনিয়ে নিলো তলোয়ার। হারেস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। বৃদ্ধ ছেলেকে বললো, 'আহাম্মক, আগে আমার কথা শুনে নাও।'

দাউদও তাকে টেনে তুলে বললো, 'এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সবকিছু ভাল ভাবে চিন্তা করে নেয়া ভাল। আগে নিজেদের মধ্যে একটা যুক্তি পরামর্শ করে নাও।'

হারেস অবশেষে মেনে নিল তাদের কথা। সে সুস্থির হয়ে বসলো কিন্তু তার রাগ মিটলো না। তার চোখে মুখে রাগের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল।

'তাকে হত্যা করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়!' বৃদ্ধ তার ক্ষুব্ধ পুত্রকে শান্ত করতে বললো, 'তিনি এখন গভীর ঘুমে অচেতন। এখন তো আমার এ দুর্বল বাহুও তাকে হত্যা করতে পারবে। তাঁর লাশও গোপন করা সম্ভব। কিন্তু তার দুই সাথী, যারা চলে গেছে, তারা তো আমাকে ছাড়বে না। তারা সন্দেহ করে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তোমার যুবতী বোন ও বৌমাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করবে। যদি আমি তাদের বলি, মুশেলের আমীর এখান থেকে চলে গেছেন, তারা কিছুতেই সে কথা মানবে না। কারণ তারা তো তাকে এখানেই রেখে গেছে। আবার তারা এখানেই তার কাছে ফিরে আসবে খবর নিয়ে।'

'মনে হচ্ছে আপনি সাইফুদ্দিনকে ভাল মানুষ মনে করেন?' হারেস বললো, 'আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করা জায়েজ মনে করেন?'

'তাকে আমার গৃহে হত্যা করার ব্যাপারে আপত্তির এও এক কারণ।' বৃদ্ধ বললো, 'আমি তার সঙ্গীদের সামনেই তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, তিনি ভুল পথে চলছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পৃষ্ঠপোষক মনে হচ্ছে? তিনি আমাকে লোভও দেখিয়েছেন। বলেছেন, যদি তোমার ছেলে এ যুদ্ধে মারা গিয়ে থাকে তবে তার বিনিময়ে তোমাকে অঢেল অর্থ দান করবো। আমি তাকে বলেছি, আমি কামনা করি আমার ছেলে শহীদ হোক, কিন্তু হারাম মৃত্যু ও হারাম মাল কখনো আমার কাম্য নয়। সাইফুদ্দিন আমার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করেন। তাকে হত্যা করে লাশ গোপন করে দিলে তাতে চরম বিশ্বাসঘাতকতা হবে। তার কমাণ্ডার ও সহকারী সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রেফতার করবে। বলবে, তুমি সালাহউদ্দিনের সমর্থক বলে মুশেলের আমীরকে হত্যা করেছো।'

'দাউদ ভাই!' হারেস দাউদকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বলো এখন আমি করি! তুমি তো আমার মনের কথা জানো। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলে, আল্লাহ্ আমার গোনাহর কাফফারা আদায় করার জন্য জীবিত রেখেছেন। কাফফারা আদায়ের এমন সুযোগ আর কি হতে পারে! যার দরুণ অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়েছে এবং বেঁচে থাকলে আরো হবে তাকে শেষ করে দেয়াই কি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়?'

'এই একটি মাত্র লোককে হত্যা করে কোন লাভ হবে না।' দাউদ বললো, 'এর যারা বন্ধু, মিত্র বাহিনী ও উপদেষ্টা আছে,

এ লড়াই তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ফসল। তারা হলবে ও হারানে বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। বহু সেনাপতি ও কমাণ্ডার আছে এ তিন সেনাদলে। মাত্র এক সাইফুদ্দিনকে হত্যা করে এ যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। এদেরকে নিরস্ত্র করার জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের ময়দান। প্রবল প্রতিরোধ ও চাপের মুখেই তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হবে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীই কেবল তাদের উপযুক্ত দাওয়াই দিতে পারেন।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। এত বড় কাজ একমাত্র সুলতান আইয়ুবী ছাড়া আর কে করবেন।' হারেস বললো, 'কিন্তু আমার বুকের মধ্যে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছে, তা কেমন করে নিভবে? তিন মুজাহিদকে হত্যার কাফফারা কেমন করে আদায় করবো আমি?'

মুশেলের আমীরকে অযাচিতভাবে পেয়ে দাউদ খুব খুশী হয়েছিল। সে যে একজন গোয়েন্দা এ কথা হারেস ও তার বাবাকে বলতে ভয় পাচ্ছিল। আবেগ ও উত্তেজনার বশে নিজের পরিচয় প্রকাশ করা কোন গোয়েন্দার কাজ নয়। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ না করলে ওদের সাহায্য সহযোগিতা নেয়া দুষ্কর হয়ে উঠতে পারে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সাইফুদ্দিন যেখানেই যাক, সে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করবে। তার প্রতিটি তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র গভীর ভাবে লক্ষ্য করবে। কিন্তু ততদিন কি বলে সে হারেসের গৃহে অবস্থান করবে! এ জন্যই সব কথা হারেস ও তার বাবাকে খুলে বলা

দরকার। তার পরিচয় প্রকাশ করলে খুব যে বিপদ হবে, তা মনে হয় না। হারেস তো সাইফুদ্দিনকে হত্যা করতেই চেয়েছিল। তার বাবাও সাইফুদ্দিনের কাজকে তার মুখের ওপর ভুল বলেছে। এসব ভেবেই দাউদ বললো, 'যদি আমি তোমাকে এমন উপায় বলে দেই, যাতে সাইফুদ্দিন ভবিষ্যতে আর দাঁড়ানোর সুযোগ না পায়, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গী হবে?'

'আশা করি আমার ছেলের মত তুমি আবেগের বশে কিছু বলবে না। সুচিন্তিত উপায় বের করতে পারলে তুমি অবশ্যই আমাদের সহযোগিতা পাবে।' হারেসের বাবা বললেন।

'তাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন সিদ্ধান্তই আমার মনে ধরবে না।' হারেস বললো।

'হারেস, যদি তুমি তোমার আবেগ ও চিন্তা ভাবনা সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে রাজি হও, তবে তোমাকে এমন কাজে লাগাবো, যাতে তোমার আত্মা শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে যায়।' দাউদ হারেসের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললো।

হারেসের স্ত্রী ও বোন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। দাউদ তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে একটি কোরআন শরীফ দিতে পারো?'

হারেসের বোন তাক থেকে কোরআন নিয়ে বুকে ও চোখে লাগিয়ে চুমো দিয়ে দাউদের দিকে এগিয়ে দিল। দাউদ কোরআন শরীফ খুলে এক জায়গায় আঙ্গুল রেখে পড়তে শুরু করলো, 'শয়তান তাকে তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে,

আর আল্লাহর ভয় ও স্মরণ তার মন থেকে দূর হয়ে গেছে। এ দলগুলো শয়তানের বাহিনী! আর স্মরণ রেখো, শয়তানের বাহিনী ধ্বংস ও ক্ষতি সাধনকারী। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে, সে অবশ্যই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হবে।'

এটা আটাশ পারার আঠারো সূরার উনিশ আয়াত। দাউদ আয়াতটি পড়া শেষ করে কোরআন শরীফ বন্ধ করে বললো, 'এটা আল্লাহর পবিত্র কালাম। আমি কোন মনগড়া কথা বলছি না, এ কথাগুলো সরাসরি আল্লাহ্ই বলেছেন। এ আয়াত স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে, সম্মিলিত বাহিনী মূলতঃ শয়তানের বাহিনী। কোরআন বলছে, যে লোকেরা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধিতা করবে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হবে। কিন্তু তারা সে পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও পদদলিত হবে না, যতক্ষণ না আমরা তাদের পদদলিত করতে এগিয়ে যাবো। ওরা শয়তানের দল, এ কথা জানার পর ওদের লাঞ্ছিত ও পদদলিত করা আমাদের ওপর ফরজ হয়ে গেছে।'

সে কোরআন দু'হাতের ওপর রেখে হাত সামনে বাড়িয়ে সবাইকে বললো, 'সবাই যার যার ডান হাত আল্লাহর এ পাক কালামের ওপর রাখো। তারপর আমার সামনে অঙ্গীকার করো, যে গোপন কথা আমি তোমাদের বলবো, তা কখনো প্রকাশ করবে না। শত্রুদের পরাজিত ও ধ্বংস করতে নিজের জীবন আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানী দেবে।'

মেয়ে দু'জনসহ সকলেই কোরআনের ওপর হাত রেখে

অঙ্গীকার করলো। কোরআনের শপথ তাদের মনে বজ্রকঠিন সংকল্প সৃষ্টি করে দিল। তাদের চেহারায় সে অভিব্যক্তি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কামরার মধ্যে বিরাজ করছিল পিনপতন নীরবতা। কারো নি:শ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল না। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে ছিল দাউদের দিকে।

'তোমরা সবাই কোরআনের ওপর হাত রেখে কসম খেয়েছে।' দাউদ বললো, 'আল্লাহতায়ালা কোরআন তোমাদের ভাষাতেই অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা এ পবিত্র কিতাবের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য বুঝতে পারো। যদি তোমরা এ শপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, সে শাস্তির কথা কোরআনেই উল্লেখ আছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের মত লাঞ্ছিত ও পদদলিত করবেন, যেমন শয়তানের বাহিনীকে করা হবে।'

'তুমি কে?' বৃদ্ধ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোন বড় ওলি-দরবেশের অনুসারী মনে হয়!'

'আমার কাছে কোন ওলি-দরবেশের বিদ্যা বা জ্ঞান নেই।' দাউদ বললো, 'আমার কাছে আছে আল্লাহর কালাম ও সেই কালামের নির্দেশ, যা সব সময় আমাকে পথ দেখায়। আমি কোরআনের আলোয় পথ চলতে ও কাজ করতে গিয়ে জানবাজি রেখে এখানে এসে পৌঁছেছি। এ শিক্ষা কোন আলেম ও পীরের কাছ থেকে লাভ করিনি, আমার শিক্ষক ও আমার নেতা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। আমি মুশেলের বাসিন্দা নই। দামেশকের নাগরিক আমি। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা হিসাবে আমি এখানে এসেছি। এই সে গোপন

কথা, যে কথা গোপন রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে কোরআন ছুঁয়ে শপথ করিয়েছি, যেন তোমরা এ গোপন তথ্য ফাঁস করে না দাও। তোমাদের সহযোগিতা দরকার আমার। আমাকে আশ্বাস দাও, তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে?'

'হ্যাঁ, আমরা কোরআনের কসম করে এ আশ্বাস তোমাকে দিচ্ছি।' বৃদ্ধ বললো, 'তুমি এখন কিভাবে কি করতে চাও সব খুলে বলো।'

'আল্লাহর অসীম রহমত আমার ওপর।' দাউদ বললো, 'আমি যে লোকটির মনের কথা বের করার জন্য সুলতান আইয়ুবীর কাছ থেকে মুশেলের দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম, সে লোকটি এখন এখানে এই কুটিরের চালার নিচে শুয়ে আছে। আল্লাহ আমাকে তার কুদরতি মদদে সঠিক স্থানে পৌছে দিয়েছেন। এখন আমাকে জানতে হবে, সাইফুদ্দিন ও তার সাথীরা পরবর্তীতে কি সংকল্প ও কি কর্মসূচী গ্রহণ করে। যদি এরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে তবে সে তৎপরতার খবর আগেই পৌছে দিতে হবে আইয়ুবীর দরবারে। যাতে তিনি তাদের সব ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে পারেন। এখন তাদের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা জানাই আমার কাছ। আল্লাহ না করুন, তারা যদি সুলতান আইয়ুবীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করে বসে তাহলে তার কি পরিণাম হবে ভাবতে পারেন?'

'সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়ে যারা মুসলমানদের হত্যা করতে চায়, তাদেরকে কি হত্যার করার অনুমতি দেয়া হবে?' হারেস

জিজ্ঞেস করলো।
'সে কথাও আমি বলছি তোমাকে।' দাউদ বললো, 'খেয়ালের বশে হত্যা না করাই উচিত। তোমাকে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ধীরস্থির মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উঠাতে হবে। এখন সাইফুদ্দিনের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের। তাকে অনুসরণ করে জানতে হবে তার পরিকল্পনা কি। তিনি এখন এখানে আত্মগোপন করে আছেন। তুমি এবং আমিও আত্মগোপন করে কৌশলে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকবো। তারপর যখন সময় হবে তখন আমি বলবো, হ্যাঁ, এবার তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারো। তার আগে তাকে হত্যা করার চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দাও।'

সাইফুদ্দিন তখনো সেই বাড়ীতেই এক কামরায় গভীর নিদ্রায় শায়িত। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ একটু উঁকি মেরে দেখলো তখনো ঘুমিয়ে আছে মুশালের আমীর। দেখতে দেখতে সূর্য উপরে উঠে গেল। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো তার। হারেসের স্ত্রী ও বোন সকালের নাস্তা নিয়ে প্রবেশ করলো তার কামরায়। সাইফুদ্দিন হারেসের বোনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। নাস্তা রেখে চলে যাচ্ছিল সে, সাইফুদ্দিন তাকে কাছে ডাকলো। বললো, 'তুমি আমার যে খেদমত করছো, আমি অবশ্যই তার যথাযথ মূল্য দান করবো। যে দান তুমি কোন দিন কল্পনাও করোনি। আমি তোমাকে আমার শাহী মহলে সুখের পায়রা বানিয়ে রাখবো।'

'যদি আমি আপনাকে এই কুটিরেই মেহমান বানিয়ে রাখি, তাতে কি আপনি খুশী হবেন না?' মেয়েটি হেসে বললো।

'আমি তো মরুভূমিতেও থাকতে পারি।' সাইফুদ্দিন বললো, 'কিন্তু তুমি তো ফুলের সাথে সাজিয়ে রাখার জিনিস।'

'আপনার কি বিশ্বাস, আপনার ভাগ্যে আবার মহলে ফিরে যাওয়া লেখা আছে?' মেয়েটি বললো।

'এমন কথা তুমি কেমন করে বললে?'

'আপনার অবস্থা দেখে বলছি।' মেয়েটি বললো, 'আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার! শাহী মহলের পরিবর্তে লুকিয়ে আছেন এক গরীবের কুটিরে। পাইক-পেয়াদা, সৈন্য-সামন্ত, মন্ত্রী-পারিষদ কেউ পাশে নেই। আপনি তো এখন এক রাজ্যহারা রাজা।'

'না, সবকিছু তুমি জানো না। সৈন্যরা এখনো আমার সঙ্গ ছাড়েনি।' সাইফুদ্দিন বললো, 'একটু বিশ্রামের জন্য আমি এখানে থেমেছি। মহল শুধু আমার ভাগ্যে নয়, তোমার ভাগ্যেও লেখা আছে। তুমি কি আমার সাথে যেতে রাজী হবে?'

হারেসের স্ত্রী কামরা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, বোনটি কথা বলছিল সাইফুদ্দিনের সাথে। সাইফুদ্দিনের প্রস্তাব শুনে সে বললো, 'যদি আপনার জায়গায় আমি হতাম, তবে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত না করে মহলের নামও মুখে আনতাম না। যদি আমাকে আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, তবে আমার মনোভাবও আপনার জানা দরকার। লুকিয়ে

থাকা লোক আমি মোটেই পছন্দ করি না। যদি যোদ্ধার বেশে দুঃসাহসী সেনাপতির মত আপনি প্রকাশ্যে বের হয়ে নিজের সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান আইয়ুবীকে আক্রমণ করতে পারেন, কেবল তখনই আমি আপনার মহলে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি।'

কৈশোরের চাপল্য এখনো কাটেনি মেয়েটির। যৌবনের ঘরে সবেমাত্র পা দিতে শুরু করেছে। এ বয়েসী মেয়েদের চেহারায় সারল্য যেমন তিরতির করে, বয়স্ক মেয়েদের মত পাকামীও অদ্ভুত সুন্দর লাগে। তার সে সারল্যভরা গাম্ভীর্যের মোহময় সৌন্দর্য সাইফুদ্দিনের অন্তরে এক ধরনের পুলক ও আকর্ষণ সৃষ্টি করছিল। সাইফুদ্দিন আগ্রহভরে দেখছিল ফুটনোন্মোখ এক পুষ্পের প্রস্ফুটন। মেয়েটির ঠোঁটে এমন মিষ্টি হাসি ছিল, যার মধ্যে ছিল কিছু দুষ্টুমি, কিছু অনুরাগ।

'একদম রানীর মত কথা বলছো তুমি। রাজার ঘর আলোকিত করার জন্য এমন মেয়েই তো চাই!'

'আমি কোন শাহজাদী নই।' মেয়েটি বললো, 'এ পাহাড়ী উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেছি আমি। এখানেই লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছি। আমি এক সৈনিকের কন্যা, আরেক সৈনিকের বোন। মহলে নয়, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা করেন তবে আপনার সাথে যেতে পারি। আপনি তখন আমার সাথে তলোয়ার যুদ্ধ খেলতে পারবেন, পাহাড়ের ওপর ছুটাছুটি করতে পারবেন, ঘোড়দৌড় খেলতে পারবেন। কি, যাবেন যুদ্ধে?'

'বাহ! তুমি তো কেবল সুন্দরী নও, বীরাঙ্গণা যোদ্ধাও দেখছি! দেখো তো, পঙ্খীরাজের ঘোড়ায় চড়ে আসা রাজপুত্তুর মনে হয় না আমাকে?' সাইফুদ্দিন তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললো, 'কি রেশম কোমল চুল! এমন আকর্ষণীয় চুল আমি খুব কমই দেখেছি।'

মেয়েটি তার হাত আস্তে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার চুল নয়, আপনার প্রয়োজন এখন শক্ত বাহুর। বলুন, এখন আপনার কি ইচ্ছা?'

'আমি কি আমার রানীর ইচ্ছা পায়ে ঠেলতে পারি! তবে ভয় কি জানো, তোমার বাবা অতি ভয়ংকর লোক! মনে হয় সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমর্থক। আমাকে তেমন পছন্দ করে না। তোমার বাবা তো আমাকে আবার ধোঁকা দেবে না?'

মেয়েটি শিশুর মত হেসে বললো, 'বাবা বুড়ো মানুষ, জানি না আপনার সাথে কি কথা বলেছে। আমার সামনে রাতে তো বাবা আপনার প্রশংসাই করলো। তিনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শুধু নামই শুনেছেন, কোনদিন চোখেও দেখেননি। বাবা তার সমর্থক হতে যাবেন কেন? বাবাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর তিনি তো বৃদ্ধ মানুষ, আপনার কিইবা ক্ষতি করতে পারবে। আপনার তো বাবাকে দরকার নেই। আমাকে পছন্দ হলে আমাকে বলবেন। আপনার সাথে বাবা যাবেন না, গেলে আমি যাবো।'

সাইফুদ্দিন তার দিকে হাত বাড়ালো। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে দ্রুত পিছনে সরে গেল। বললো, 'অ-মা, সবুরে মেওয়া ফলে তাও জানো না! আমি তো বলেছি, ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকা টিকটিকি আমি একদম পছন্দ করি না। জানো না, বীর

ভোগ্যা বসুন্ধরা। আগে সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করো। তারপর.....'

'তারপর কি রানী!'

'কচু!' মেয়েটি ভেংচি কেটে বললো। তারপর দু'কদম সামনে এগিয়ে স্বর গম্ভীর করে বললো, 'এখন আপনি বিপদগ্রস্ত। কেন বুঝেন না, এ সময় অন্য কোন চিন্তা মাথায় রাখা ঠিক নয়। এবার বলুন, আপনার ইচ্ছাটা কি। যুদ্ধের ব্যাপারে কি পরিকল্পনা করছেন?'

সাইফুদ্দিন ছিল চতুর নারী শিকারী। যুবতী ও সুন্দরী মেয়ে তার কাছে কোন নতুন ও বিরল জিনিস ছিল না। কিন্তু তিনি এ মেয়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য সরলতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করলেন যে, নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। সে ডাকলে যে কোন মেয়েই পোষা বিড়ালের মত কাছে চলে আসে। তার ইশারায় তারা হাসে, তার ইশারায় নাচে। কিন্তু এ কেমন অদ্ভুত মেয়ে, ধরাও দেয় না, সরেও যায় না! অথচ এ মেয়ে এমন সাংঘাতিক, অবলীলায় তার পৌরুষে আঘাত করতেও ভয় পায় না। এক বাদশাহর সাথে কথা বলতে যে সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রকাশ করতে হয়, এ মেয়ে যেন তা জানেই না।

'আচ্ছা তাই হবে।' সাইফুদ্দিন বললো, 'তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছো তো, আমি ওয়াদা করছি, যে পর্যন্ত আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর তলোয়ার কেড়ে নিতে না পারবো সে পর্যন্ত আমি তোমাকে স্পর্শও করব না। তুমি অঙ্গীকার করো, তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আমি যখন তোমার কাছে আসবো, তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে না?'

'অঙ্গীকারের দরকার কি! আপনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন, যুদ্ধের ময়দানেও আমি আপনার পাশে থাকবো।' বললো মেয়েটি।

'না!' সাইফুদ্দিন বললো, 'আমি এখন আমার সৈন্যদের একত্রিত করবো। নতুনভাবে সেনাবাহিনী গড়ে তুলবো। আমি আমার সহকারীকে মোশেল পাঠিয়েছি। তাকে বলে দিয়েছি সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে। যত দ্রুত সম্ভব সৈন্যদের সংগঠিত করেই আমি সালাহউদ্দিনের ওপর আক্রমণ চালাবো। কিছুতেই তাকে আমি আমাদের শহরগুলো অবরোধ করার সুযোগ দেবো না। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আমার পাঠানো দু'জন লোকই ফিরে আসবে। তারা এলেই জানতে পারবো, হলব ও হারানের সৈন্যরা কি অবস্থায় আছে। আমি পরাজয় মেনে নিয়ে পালিয়ে থাকার লোক নই। তুমি নিশ্চিত থাকো, আমি আবার আক্রমণ চালাবো এবং তা অতিশীঘ্রই।'

সাইফুদ্দিন গাজী কি ধরনের লোক বুঝা হয়ে গেল মেয়েটির। লোকটি কেবল চরিত্রহীন নয়, ব্যক্তিত্বহীনও। যে লোক গ্রামের এক কিশোরী কন্যার কথার জালে আটকা পড়ে যুদ্ধের মত স্পর্শকাতর বিষয়ের গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারে, তার মত দুর্বল চরিত্রের লোকের কোন প্রয়োজন নেই দেশ ও জাতির। এ ধরনের লোকেরা লোভে পড়ে নিজের দেশ, এমনকি নিজের ঈমানটুকুও নিলামে বিক্রি করে দিতে পারে। মেয়েটি সাইফুদ্দিনের কথা শুনে এমন একটি ভাব করলো, যেন যুদ্ধ যাত্রার কথা শুনে সে খুব খুশী হয়েছে এবং এ ভাব

প্রকাশ করার জন্যই সে তার কাছটিতে গিয়ে তার একটি হাত তুলে নিল নিজের হাতে, চকিতে সে হাতে একটি চুমু খেয়ে দ্রুত ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

সাইফুদ্দিনের যে দুই সঙ্গীর একজন মুশেল ও অন্য জন হলবে গিয়েছিল, তাদের কেউ তখনো ফিরে আসেনি। মেয়েটি কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা তার বাবা, ভাই হারেস ও দাউদ যে রুমে বসেছিল, সেখানে চলে গেল। তাদের সে শোনাল সাইফুদ্দিনের পরিকল্পনার কথা। বললো, 'তার পরিকল্পনা হলো, তিনটি বাহিনীকে একত্রিত করে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর দ্রুত আক্রমণ করা, যাতে আইয়ুবী অগ্রসর হয়ে তাদের শহর ও এলাকা অধিকার বা অবরোধ করতে না পারে। যে দুই লোক চলে গেছে, তারা এসে বলবে, সৈন্যেরা যুদ্ধের অবস্থায় আছে, কি নেই।'
এ মেয়েটির নাম ছিল ফৌজি। সে কেবল রূপসীই ছিল না, অসম্ভব চালাক এবং বুদ্ধিমতিও ছিল। দাউদ তাকে বললো, 'তুমি খুব মুল্যবান খবর এনেছো! ট্রেনিং ছাড়াই তুমি এতসব খবর কেমন করে তার পেট থেকে বের করলে?'
'রাতে আপনি বলেছিলেন, সাইফদ্দিনের পরবর্তী পরিকল্পনা কি তা জানা আপনার খুবই দরকার। তাই একটু চেষ্টা করে দেখলাম।'
'খুবই ভাল করেছো। আমি তোমাকে কি করে গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে হয় শিখিয়ে দেবো।'

দাউদ ফৌজিকে গোয়েন্দা হিসাবে কাজকর্ম করার জন্য প্রাথমিক কিছু নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিল। তারপর বললো, 'সাইফুদ্দিন দুশ্চরিত্র ও আরামপ্রিয় লোক। তার প্রতারণার জাল থেকে সাবধান থাকবে।'

ফৌজি এ দায়িত্ব খুশী মনেই গ্রহণ করলো। সে যেভাবে সাইফুদ্দিনের কাছ থেকে কথা বের করে নিয়েছিল, তাতে দাউদ বুঝতে পেরেছিল, এ মেয়ে সাইফুদ্দিনকে ঠিকই ঘায়েল করতে পারবে।

গভীর রাত। হঠাৎ কোন আওয়াজে বৃদ্ধের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙতেই মনে হলো কেউ দরজায় করাঘাত করছে। বৃদ্ধ বিছানায় উঠে বসলো। এ সময় কানে এলো ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি। দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুললো বৃদ্ধ। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সাইফুদ্দিনের সহকারী সেনাপতি। বৃদ্ধ তার ঘোড়া নিয়ে বাড়ীর পেছনে বেঁধে রাখলো। কামরায় এলে সাইফুদ্দিন তাকে বললো, 'তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো।'

বৃদ্ধ আদবের সাথে সালাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। ভেতরের কামরায় গিয়ে ডেকে তুললো দাউদকে। ফিসফিস করে বললো, 'সহকারী সেনাপতি ফিরে এসেছে!' তারা উভয়েই দরজায় কান লাগিয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলো।

'গুমাস্তগীন সম্পর্কে জানতে পারলাম, তিনি আল মালেকুস সালেহের সাথে হলবে আছেন।' সহকারী সেনাপতি বললো, 'মুশেলের অবস্থা তেমন খারাপ নয়। আমাদের যে সৈন্যরা ওখানে আছে তাদের যখন ইচ্ছা ময়দানে নিয়ে নেয়া যাবে।

আমাদের অর্ধেকের বেশী সৈন্য ফিরে আসতে পেরেছে। অবশিষ্ট সৈন্যদের কিছু নিহত হয়েছে, অধিকাংশই বন্দী হয়েছে। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অগ্রাভিযান বন্ধ করে দিয়ে তুর্কমানে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়েছেন। খৃস্টান গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, তারা আল-জাজায়ের, বাকার, দাইয়ার ও তার আশপাশের এলাকা থেকে লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করছে। মনে হয়, আইয়ুবী সহসা কোন অভিযানের চিন্তা করছে না। হয়তো সে অবস্থাও তার নেই।'

সাইফুদ্দিন বললো, 'তুমি আইয়ুবীকে চেনো না। সে অবশ্যই অভিযান চালাবে! আর তার সে অভিযানের গতি হবে ঝড়ের মত দ্রুত!'

'কিন্তু তাদের ক্যাম্পের অবস্থা বলছে, তারা সেখানে দীর্ঘদিন থাকবে। আমি খবর পেয়েছি, তারা ভাবছে, আমরা যুদ্ধ করার অবস্থায় নেই। আমাদের বহু সৈন্য তাদের হাতে বন্দী হওয়ায় তারা ভাবছে, আমরা শেষ হয়ে গেছি। উঠে দাঁড়াতে হলে আমাদের অনেকদিন লাগবে।'

'তাহলে আমরা যদি এক কাজ করি, আমাদের হাতে যে সৈন্য আছে তা নিয়ে এখনি সুলতান সালাহউদ্দিনের ওপর আক্রমণ করে বসি, তাহলে কেমন হয়?' সাইফুদ্দিন তাকে প্রশ্ন করলো, 'অযাচিত হামলার শিকার হলে ওরা নির্ঘাত ধরা খাবে। মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়ার আগেই আমরা ওদের তছনছ ও নাস্তানাবুদ করে দিতে পারবো!'

'শুধু আমাদের সৈন্য এ আক্রমণের জন্য যথেষ্ট নয়।' সহকারী

সেনাপতি উত্তরে বললো, 'আল মালেকুস সালেহ্ ও গুমাস্তগীনকেও সঙ্গে নেয়া প্রয়োজন। খৃস্টান উপদেষ্টারা আমাকে এ পরামর্শই দিয়েছে।'

'তুমি কি তাদের বলে দিয়েছো, আমি কোথায়?' সাইফুদ্দিন জিজ্ঞেস করলো।

'আমি এখানকার ঠিকানা বলিনি!' সহকারী সেনাপতি উত্তর দিলো, 'আমি তাদের বলেছি, আপনি তুর্কমানের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গতিবিধি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, এখানে বেশী দিন থাকা আপনার ঠিক হবে না। তিন-চার দিনের মধ্যেই আপনার মুশেল চলে যাওয়া উচিত।'

'আগে আমাকে হলবের সংবাদ জানতে দাও!' সাইফুদ্দিন বললো, 'কমাণ্ডার আজ না এলেও আগামীকালের মধ্যেই ফিরে আসবে। তুমি জানো, গুমাস্তগীন শয়তান প্রকৃতির লোক! তার তো নিজের দূর্গ হারানে চলে যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে না গিয়ে হলবে বসে কি করছে গুমাস্তগীন? শোন, আমি মুশেল যাওয়ার আগে হলবে যাবো। গুমাস্তগীন আমাদের ঐক্যজোটের শরীক হলেও তাকে আমি বন্ধু বলতে পারি না। সে ওখানে কি করছে দেখতে হবে আমাকে। তাছাড়া আল মালেকুস সালেহের সাথেও সামনের লড়াই সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। আমরা আক্রমণ করতে যত দেরী করবো ততই সুলতান আইয়ুবীর লাভ। আমরা এ সুযোগ তাকে দিতে পারি না, এ বিষয়টিও

সালেহকে বুঝাতে হবে। নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই, যা করার জলদি করতে হবে।'

'হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে, এবার আর তিন বাহিনীকে আলাদা রাখা যাবে না। তিনটি বাহিনীই একটি একক কমাণ্ডের অধীনে যুদ্ধ করবে। আর সম্মিলিত বাহিনীর হাইকমাণ্ড থাকবে যোগ্য সেনাপতির হাতে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। আমরা শুধু এ কারণেই পরাজিত হয়েছি, আমাদের সৈন্যরা পৃথক পৃথক কমাণ্ডে লড়াই করেছিল। আমরা একে অন্যের যুদ্ধের চাল সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। নইলে মুজাফফরুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর পাশ থেকে যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল, তার কখনো ব্যর্থ হওয়ার কথা ছিল না।'

'আমার আরেকটি কথা, কেন্দ্রীয় কমাণ্ড আপনার হাতেই থাকতে হবে।' সহকারী সেনাপতি বললো।

'এবং আমাদের বন্ধুদের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।' হেসে বললো সাইফুদ্দিন, 'খৃস্টানরা কি আমাদেরকে ঠিক মত সাহায্য দিবে?'

'তারা তো আর সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে না।' সহকারী সেনাপতি বললো, 'উট, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র এসব সরবরাহ করবে।'

সহকারী সেনাপতি কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না!' সাইফুদ্দিন বললো, 'বৃদ্ধকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। তার মেয়েটাও জালে আটকা পড়ে গেছে। মেয়েটা বড় আবেগী আর স্ফূর্তিবাজ। সে আমাকে বলে কি জানো, আগে

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত করেন, তার তলোয়ার কেড়ে নিয়ে তার অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বিজয়ীর বেশে আসুন, আমি আপনার সাথে যাবো।'

সহকারী সেনাপতি হো হো করে হেসে উঠলো। হারেস, তার বাবা এবং দাউদ দরজায় কান লাগিয়ে ওদের সব কথাই শুনছিল। সাইফুদ্দিন ও তার সহকারী জানতেও পারেনি, এ বাড়ীতে বৃদ্ধ এবং দু'টি মেয়ে মানুষ ছাড়া আরো দু'জন নওজোয়ান আছে, যারা যে কোন সময় তাদের হত্যা করতে পারে। সাইফুদ্দিনের দুর্ভাগ্য, ফৌজিকে জালে জড়ানোর পরিবর্তে নিজেই যে এক কঠিন জালে আটকা পড়ে আছে, এ কথাটাও জানতো না সাইফুদ্দিন, এমনকি এরকম কোন সন্দেহও তার মনে জাগেনি কখনো।

সারাদিন দাউদ ও হারেস ঘরের বাইরে এলো না। বাড়ীর একদম পেছনের কামরায় চুপচাপ দুই বন্ধু আত্মগোপন করে রইলো। বাইরের দিকের কামরায় সাইফুদ্দিন ও তার সহকারী দরজা বন্ধ করে শুয়ে বসে সময় কাটালো, তারাও কেউ ঘরের বাইরে গেল না।

অতিরিক্ত চারজন বলিষ্ঠ পুরুষ এ বাড়ীতে আছে, পাড়াপড়শীরা এ জন্যই তা টের পেলো না। বুড়োও এসব দিকে খেয়াল রাখছিল। বাড়ীর বাইরে সামনের চত্বরে এটা ওটা করার বাহানায় বলতে গেলে সারাটা দিন বুড়ো বাইরেই কাটিয়ে দিল।

দিনের বেলা ফৌজি বেশ কয়েকবার তার কামরায় গিয়েছিল। সে সাইফুদ্দিনের সাথে কথা বলতো, কিন্তু ধরা দিতো না। তার এ লুকোচুরি স্বভাবের কারণে সাইফুদ্দিন আরো

গভীরভাবে ঝুঁকে পড়লো মেয়েটির দিকে। সে ফৌজিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা! তোমার যে ভাই আমার বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে আছে, তাকে যদি আমি কমাণ্ডার পদে উন্নীত করে দেই, কেমন হয়?'
'কেমন আবার! যেমন হবার তেমন হয়!' তরল কোমল কৌতুক মেশানো কণ্ঠ ফৌজির।
'আর যদি তোমাকে, তোমার ভাবী ও বাবাকে আমি যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাই, তাহলে কেমন হয়!'
'পঁচা হয়!'
'কেন?'
'বাহ, কনের সাথে কেউ তার বাবাকে আর ভাবীকে নেয় নাকি! কি বোকা বোকা কথা!'
এভাবেই হাস্য-তরল আলাপের মধ্য দিয়ে দিনটি কাটিয়ে দিল সাইফুদ্দিন। ফৌজির বাবাও দু'একবার সে কামরায় ঢু দিয়েছে। তাদের কিছু লাগবে কিনা, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা, এইসব খোঁজখবর নিয়েছে। মূলতঃ সাইফুদ্দিনকে বৃদ্ধ বুঝাতে চাচ্ছিলো, সে তার খুব বাধ্য ও অনুগত একজন প্রজা।
দিন পেরিয়ে রাত এলো। বৃদ্ধ উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল, কখন আবার দরজায় কারাঘাত শুনবে। রাতের প্রথম প্রহরেই এলো সেই কমাণ্ডার। দরজায় করাঘাত শুনেই বৃদ্ধ এগিয়ে দরজা খুলে ধরলো। বাইরে সাইফুদ্দিনের হলব থেকে আগত কমাণ্ডার দাঁড়িয়ে ছিল। বৃদ্ধ তাকে সাইফুদ্দিনের কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে ঘোড়াটি অন্য ঘোড়াগুলোর পাশে নিয়ে বেঁধে রাখলো।

বৃদ্ধ যখন ঘরে ঢুকলো তখন কমাণ্ডার বলছিল, 'সারা পথ আমি খুব দ্রুতবেগে ছুটে এসেছি। রাস্তায় কোথাও থামেনি। সে কারণে রাস্তায় আমার খাওয়া-দাওয়াও সম্ভব হয়নি।'

এ কথা শুনেই বৃদ্ধ কমাণ্ডারের খাবার আনতে ভেতরে চলে গেল। ফৌজি বললো, 'বাবা, তুমি শুয়ে পড়োগে। আমি নিজেই ওর খাবার নিয়ে যাচ্ছি।'

ফৌজির বুড়ো বাপ বাধ্য ছেলের মত বিছানায় উঠে গেল। কমাণ্ডারের জন্য খাবার নিয়ে কামরায় ঢুকলো ফৌজি। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কমাণ্ডারের কথা। সাইফুদ্দিন হেসে বললো, 'তুমি কথা বলো, এ মেয়ে এখন আমাদেরই একজন।'

ফৌজি কমাণ্ডারের সামনে খাবার রেখে সাইফুদ্দিনের পাশে গিয়ে বসলো। এই প্রথম সে সাইফুদ্দিনের খুব কাছাকাছি গিয়ে বসেছিলো। সাইফুদ্দিন তার একটি হাত নিজের হাতে টেনে নিল। ফৌজির দিনের চাপল্য কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। নিস্তরঙ্গ রাত যেন তার মধ্যেও নিবেদনের এক ধরনের আর্তি নিয়ে এসেছে। সে হাত ছাড়িয়ে না নিয়ে মুগ্ধ চোখে সাইফুদ্দিনের হাতের আংটির সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। ফৌজির এ আচরণ যে খৃস্টানের এক বন্ধুকে হাতের মুঠোয় আটকানোর কৌশল, সাইফুদ্দিন তা একটুও টের পেলো না।

'হলবের সামরিক অবস্থা প্রশংসার যোগ্য।' কমাণ্ডার আবার কথা বলা শুরু করলো। ফৌজি ছোট্ট খুকির মত সাইফুদ্দিনের আঙ্গুলের হীরার আংটি নাড়াচাড়া করতে লাগলো। সে এমন তন্ময় হয়ে আংটি দেখছিল, কমাণ্ডারের কথার দিকে তার যেন

কোন খেয়ালই নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কান ছিল সম্পূর্ণ সজাগ। মাথা নিচু করে সে কমাণ্ডারের প্রতিটি কথা গিলছিল।

'আল মালেকুস সালেহ্ সুলতান আইয়ুবীকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে চিঠি দিয়েছেন।'

'কি! সন্ধির চিঠি?' সাইফুদ্দিন চমকে উঠে বললো।

'জ্বী! আপোষ-মিমাংসার চিঠি!' কমাণ্ডার বললো, 'কিন্তু আমি জেনেছি, তাঁর খৃস্টান বন্ধুরা যুদ্ধে তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। তাকে পর্যাপ্ত সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্র দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তারা তাকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করারও চেষ্টা করছে। তারা তাকে পরামর্শ দিয়েছে, মুশেল ও হারানের সেনাবাহিনীকে এক কমাণ্ডে নিয়ে জলদি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ চালানোর। যদি সুলতান আইয়ুবী আশপাশের এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহের পর্যাপ্ত অবসর ও সুযোগ পেয়ে যায়, তবে তার অগ্রাভিযানে বাঁধা দেয়া দু:সাধ্য হয়ে যাবে। গোয়েন্দারা সংবাদ এনেছে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী স্বসৈন্যে তুর্কমানের শস্য-শ্যামল প্রান্তরে ক্যাম্প করে নতুন সৈন্য ভর্তি করছে। আইয়ুবী দ্রুত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আল মালেকুস সালেহের সেনাপতিরাও একমত, তুর্কমান ক্যাম্পে সুলতান আইয়ুবীর ওপর দ্রুত আক্রমণ করা দরকার।

আমি হলবের এক খৃস্টান উপদেষ্টার সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'আইয়ুবীর ওপর জলদি

আক্রমণ আমি সমর্থন করি না, কারণ সে যোগ্যতা এখন আমাদের নেই।' তিনি বললো, 'এতে তোমাদের বহু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করতে না পারলেও, এতে তার প্রস্তুতির সুযোগ নষ্ট হবে। তার অপরাজেয় বাহিনীকে প্রস্তুতির সুযোগ দিলে তা ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে তোমাদের জন্য। তাকে তুর্কমান এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ও উত্যক্ত করে আটকে রাখতে হবে। এমন কৌশলে যুদ্ধ করতে হবে, যেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রবল আকারে যুদ্ধ না হোক, খণ্ড যুদ্ধ অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। যুদ্ধের কৌশলটা হবে ঠিক সুলতান আইয়ুবীর মত, আঘাত করো আর পালিয়ে যাও।'

'খুবই উত্তম প্রস্তাব।' সাইফুদ্দিন বললো, 'এমন যুদ্ধ আমার শার্দুল ভাই সেনাপতি মুজাফফরুদ্দিনই করতে পারে। সে দীর্ঘদিন সুলতান আইয়ুবীর সহ-সেনাপতি ছিল। আইয়ুবীর প্রতিটি চাল তার মুখস্ত। আমিও একমত, আমাদের সম্মিলিত শক্তি একক কমাণ্ডে নিতে হবে।'

'আর তিন বাহিনীর যুক্ত কমাণ্ডের দায়িত্ব থাকতে হবে আপনার ওপর। কেবল আপনিই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে মরু শৃগালের ধোঁকা দিয়ে মারতে পারবেন।' বললো তার সহ-সেনাপতি।

ফৌজি তখনো আংটি নিয়ে খেলা করছিল। কমাণ্ডার বললো, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম আল মালেকুস সালেহের সাথে দেখা করার। কিন্তু তার সেনাপতি ও অন্যান্য আমীররা তাকে

এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, আমি তার কাছেও যেতে পারলাম না।'

'তোমাকে আজই আবার হলব রওনা করতে হবে।' সাইফুদ্দিন বললো, 'আল মালেকুস সালেহকে আমার চিঠি পৌঁছে দেবে।'

সাইফুদ্দিন সে রাতেই আল মালেকুস সালেহের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখলো। তাতে লিখলোঃ 'প্রিয় আল মালেকুস সালেহ! সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তুমি আমাদের ঐক্যজোটে যে ভাঙনের সৃষ্টি করেছো, এর ভয়াবহ পরিণতির কথা কি কখনো চিন্তা করেছো? আমাদের না জানিয়ে আমাদের সকলের জানের দুশমন আইয়ুবীর সাথে সন্ধি করে তুমি কি হাসিল করতে চাও আমার বুঝে আসছে না। তুমি কি মনে করো আইয়ুবী তোমাকে রেহাই দেবে? হলব দখল না করে দেশে ফিরে যাবে আইয়ুবী? তুমি এখনো খুব ছোট ও অবুঝ। রাজনীতির খেলা এখনো তোমার রপ্ত হয়নি। আইয়ুবী কিছুতেই তোমাকে রেহাই দেবে না। অন্যদিকে এ চুক্তির মাধ্যমে তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছো। আগে তোমার ওপর হামলা হলে আমরা মনে করতাম, এ হামলা হয়েছে আমাদের সবার ওপর। আমরা তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন? এখন তোমার ধ্বংস তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের আর কি করার আছে!

সালেহ! এ চুক্তির মাধ্যমে তুমি প্রকারান্তরে আইয়ুবীর সাহস

ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়েছো। কিন্তু আমরা জানি, তিনি আমাদের কাউকে ক্ষমা করবেন না। হয়তো তুমি ভয় পেয়ে গেছো। অথবা তোমার সেনাপতিরা যুদ্ধ থেকে বাঁচার আশায় তোমাকে এ পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এ পথে তোমার মুক্তি মিলবে না। তুমি আমাদের না জানিয়ে সন্ধি করে যে অপরাধ করেছো, যে ধোঁকা তুমি আমাদের দিয়েছো, তাতে তোমাকে আমাদের বয়কট করা উচিত ছিল। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সেসব আমি ভুলে যেতে রাজি আছি। বাঁচতে হলে আমাদের এক কমাণ্ডে সম্মিলিত শক্তি একত্রিত করে অনতিবিলম্বে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে। তুমি কি করতে চাও শিঘ্র জানাও আমাকে।'

—আমীরে মুশেল সাইফুদ্দিন গাজী।

ভোর রাতে কমাণ্ডারকে ডেকে তুলে সাইফুদ্দিন গাজী বললো, 'তোমাকে এ অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমাকে যেন গ্রামের কোন লোক দেখতে না পায় এ জন্যই এ সতর্কতা। যত দ্রুত পারো এ চিঠি নিয়ে হলবে পৌছবে এবং সরাসরি সালেহের হাতে এ চিঠি দেবে।'

সঙ্গে সঙ্গে কমাণ্ডার সে চিঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এ চিঠিরই জবাবই ভাগ্যক্রমে পড়েছিল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর হাতে। কিন্তু এ চিঠিতে কি লেখা হয়েছে জানতে পারলো না ফৌজি। আর ফৌজির না জানার কারণে তা জানতে পারলো না দাউদ বা হারেস, কেউ।

ফৌজি যে সব আলোচনা শুনেছিল সবই দাউদকে বলে দিয়েছিল। তথ্যগুলো খুব কাজেরও ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত তারা এইসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সকালে ফজরের নামাজের পর হারেস ও তার বাবা আবার ঘুমিয়ে গিয়েছিল। দাউদ বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে ভোরের মুক্ত হাওয়া সেবনের জন্য একটু বাইরে বেরিয়ে এলো। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়ালো তার ঘোড়ার কাছে। ফৌজিও আলতো পায়ে বেরিয়ে এলো তার পেছন পেছন।

'তুমি এর চেয়ে বড় কাজ আমাকে বলো।' ফৌজি বললো, 'আমি তোমার জন্য আমার জীবনও দিয়ে দিতে পারি।'

'আমার জন্য নয়। প্রাণ দেবে তোমার জাতির জন্য, তোমার ধর্মের জন্য।' দাউদ বললো, 'তুমি যে কাজ করছো, এটাও অনেক বড় কাজ। আমরা যারা গোয়েন্দা, এ কাজের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের জীবন কোরবানী করি। এটাই এখন আমার কাছে সবচে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটাই আমার দায়িত্ব। আমার এ কাজ আমি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি। এতে তোমাকে কিন্তু অনেক বড় বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে।'

'বিপদ কেমন?'

'এ কাজটাই বিপদজনক। তুমি যে তথ্য পাচার করছো তা জানতে পারলে তোমার খুব বিপদ হবে।' দাউদ বললো, 'সাইফুদ্দিন একজন বাদশাহ। এই কুটিরেও তিনি বাদশাহই আছেন।'

'তাতে কি? বাদশাহ কি আমাকে খেয়ে ফেলবে?' ফৌজি বললো, 'আমি খুব চালাক মেয়ে না হলেও একেবারে সহজ সরল বোকা মেয়েও নই।'
'কিন্তু তার বাদশাহীর চমক দেখলে বোকা হতে কতক্ষণ!' দাউদ বললো, 'এ সব লোকেরা জৌলুস দেখেই অন্ধ হয়ে তাদের ঈমান বিক্রি করেছে এবং ইসলামের মূল কাটছে। আমার ভয় হয় তুমি না আবার তার জালে আটকা পড়ে যাও।'
'তোমার বাড়ী কোথায়?'
'আমার কোন বাড়ী নেই।' দাউদ উত্তর দিল, 'আমি এক গোয়েন্দা ও কমাণ্ডো বাহিনীর লোক। কমাণ্ডোদের কোন বাড়ীঘর থাকতে নেই। যেখানে শত্রুদের হাতে ধরা পড়বো, সেখানেই মারা যাবো। সেই বধ্যভূমিই আমার মাতৃভূমি। সেখানকার মাটিই আমার দেহকে তার কোলে আশ্রয় দিবে। শহীদের রক্ত যে মাটিতে পড়ে সে জমিন মুসলিম সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হবেই। সে মাটিকে কুফর থেকে পবিত্র করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হয়ে যায়। আমাদের মা ও বোনেরা আমাদের লালন-পালন করে বড় করেছে, আর আল্লাহর পথে সঁপে দিয়েছে। তারা তাদের বুকের ওপর পাথর বেঁধে আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশাও ত্যাগ করেছে।'
'তোমার কি কখনো বাড়ী যাওয়ার ও তোমার মা-বোনদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা হয় না?' ফৌজি আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো।
'মানুষ ইচ্ছার দাস হয়ে গেলে ফরজ কাজ শিথিল হয়ে যায়।' দাউদ বললো, 'জীবনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আবেগের

ইচ্ছাকে কোরবানীর করতে হয়। এ কাজ করতে হলে তোমাকেও মনের সব স্বপ্ন-আশা কোরবানী দিতে হবে।'

ফৌজি তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাহলে কি সব সময় আমাকে তোমার পাশে রাখবে?'

'না, অসম্ভব! সব সময় তোমাকে আমি কি করে পাশে রাখবো?' দাউদ বললো।

'কেন, তোমার সাথে আমাকে নিয়ে যাবে, আর যদি নিতে না পারো তাহলে তুমিই এখানে থেকে যাও!' ফৌজির কণ্ঠে আবেগ।

'আমার দায়িত্ব যতদিন প্রয়োজন মনে করবে, ততদিন তো আমি এখানে অবশ্যই থাকবো।' দাউদ বললো, 'কিন্তু আমাকে তুমি তোমার কাছে রাখতে চাচ্ছো কেন?'

'আমি তোমাকে কাছে রাখতে চাইনি। কিন্তু আমার মন সারাক্ষণ তোমার কাছে কাছে থাকতে চায়।' ফৌজি বললো, 'তুমি যখন থেকে এসেছো আর আমি তোমার কথা শুনেছি, তখন থেকেই আমার মন তোমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। এমন আবেগ ও উদ্দীপনার কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। আমার মন বলে, আমি তোমার সাথেই থাকি, আর সারাক্ষণ তোমার কথা শুনি।'

'আমার পায়ে শিকল পড়াতে চেষ্টা করো না ফৌজি!' দাউদ বললো, 'তুমি নিজেকেও আবেগের শিকল থেকে মুক্ত করে ফেলো। আমাদের সামনে এখন কঠিন পথ। এ পথ আমাদের অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। যতক্ষণ প্রয়োজন এক সাথে চলবো আমরা কিন্তু তাই বলে একে অন্যকে বন্দী করার চেষ্টা করবো না।' দাউদ একটু চিন্তা করে বললো, 'ফৌজি, তুমি

বেশী দূর আমার সাথে চলতে পারবে না। আমার দায়িত্ব বড় ভয়ংকর। এ কাজ পুরুষেরই সাজে।'

'কিন্তু এখন যে এ কাজ আমাকে দিয়ে করাচ্ছো! আমি তো এক নারী!' অভিমানী কণ্ঠে বললো ফৌজি।

দাউদ এর কোন জবাব দিল না। ফৌজির চেহারা ছেয়ে গেল আশ্চর্য এক উদাসীনতায়। সে দাউদকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে সেখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। দাউদ ঝট করে তার বাহু টেনে ধরে তার চোখে চোখ রাখলো। ফৌজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলো, আস্তে এগিয়ে মিশে যেতে চাইল দাউদের সাথে।

দাউদ তাকে ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। ফৌজি আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'যে কাজ পুরুষের, সে কাজ নারীও করতে পারে। আমার সম্ভ্রম ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, ইচ্ছে হলেই যে কেউ কামড় বসাতে পারবে।' ফৌজি বললো, 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার কথা আমার মনে নতুন স্বপ্নের ইমারত গড়েছে। তুমি আমাকে যে রাস্তা দেখিয়েছ সে পথটিও আমার মনে ধরেছে। আমি তোমার পাশে এ জন্য থাকতে চাই।'

'কিন্তু ফৌজি, এ পথ বড় বন্ধুর! বড় ভয়ংকর! নিরূপায় না হলে এ কাজে মেয়েদের ব্যবহার করতে নেই!'

'বুঝি। কিন্তু এটাও জানি, এ বন্ধুর পথে চলার জন্যই চাই নারীর সান্নিধ্য। চাই মায়ের স্নেহ, বোনের মমতা ও স্ত্রীর ভালবাসা। না হলে পুরুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে উঠে। তুমি

খুব ক্লান্ত হয়ে উঠেছো দাউদ! আমার ভাবী আমাকে বলেছে, পুরুষ যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে আসে, তখন তার ক্লান্তি একমাত্র নারী ছাড়া কেউ দূর করতে পারে না। নারী না থাকলে পুরুষের মন শুকিয়ে যায়। আমি ভয় পাচ্ছি, একাকী চলতে গিয়ে তোমার আত্মা যদি শুকিয়ে যায়, তখন কি হবে দাউদ?'

দাউদ হেসে উঠলো। তার গালে টোকা দিয়ে বললো, 'তোমার এ মন ভুলানো কথা শুনেই আমার আত্মা তাজা হয়ে গেছে।'

'আমার কথায় তুমি কিছু মনে করোনি তো? আমার ভাইকে আবার বলে দিও না, আমি তোমার কাছে এসেছিলাম!'

'না, তা বলবো কেন?' দাউদ বললো, 'তোমার ভাইকে আমি এসব কথা কিছুই বলবো না। আর তোমার কোন কথাই আমার খারাপ লাগেনি।'

'দাউদ! আমাদের স্বপ্ন এক, লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যও এক।' ফৌজি বললো, 'তাই তো তোমার সাথে কথা বলে আমি মনে শান্তি পাই।'

'তুমি তোমার মনের কথাই বলেছো ফৌজি!' দাউদ বললো, 'আমি তোমার মনের কথা বুঝে নিয়েছি। তুমি ঠিকই বলেছো, আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য এক! কিন্তু এ কথা ভুলে যেও না, সামনে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের নদী। এ নদীতে কোন সাঁকো নেই। আমাকে এ নদী পার হতে হবে সাঁতরে। যদি তুমি আমার চির সঙ্গী হতে চাও, তবে আমাদের কাবিননামা লিখতে হবে রক্তের কালিতে। সত্য পথের সৈনিক ও

যাত্রীদের বিবাহ উৎসব হয় আকাশে। তাদের বরযাত্রীরা পথ চলে ধুমকেতুর রাস্তা ধরে। আকাশের তারকারাজি তো সেই উৎসব-আনন্দেই হেসে উঠে আলো ছড়ায়!'

ফৌজি যখন সেখান থেকে বিদায় নেয়, তখন তার মুখে ছিল আনন্দের হাসি। সে হাসিতে প্রকাশ পাচ্ছিল দৃঢ়তা ও সংকল্পের প্রত্যয়দীপ্ত আভা।

এর দু'দিন পরের কথা। সাইফুদ্দিন যে কমাণ্ডারকে হলবে পাঠিয়েছিল, সে ফিরে এলো। কমাণ্ডার জানালো, সে আল মালেকুস সালেহের সাথে সাক্ষাত করতে পারেনি, তবে তাকে সাইফুদ্দিনের চিঠি পৌঁছে দিয়েছে।

'তুমি কি তার কাছ থেকে এ চিঠির কোন জবাব নিয়ে আসতে পারোনি?' জানতে চাইলো সাইফুদ্দিন।

'না। তবে আমি বলে এসেছি, তিনি যেন সত্ত্বর এ চিঠির লিখিত উত্তর পাঠান।'

'তুমি কি তাকে আমার ঠিকানা দিয়ে এসেছো?'

'জ্বী।' কমাণ্ডার বললো, 'আপনার বর্তমান ঠিকানা এবং এখানে আসার একটি নকশাও এঁকে দিয়ে এসেছি।'

সাইফুদ্দিন তার চিঠির উত্তরের আশায় বসে রইলো। একদিন গেলো, দু'দিন গেলো, কিন্তু কোন উত্তর এলো না। অস্থির হয়ে উঠলো সাইফুদ্দিন। তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনেও কোন জবাব না পেয়ে নিজেই হলব যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

'আমি নিজেই হলব চলে যাই না কেন?' সহ-সেনাপতিকে

বললো সাইফুদ্দিন, 'হলবের সেনাবাহিনী সালাহউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করে থাকলে খুব ভেবে-চিন্তে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গুমাস্তগীনের ওপর কোন ভরসা করা যায় না। আমার একার পক্ষে তো যুদ্ধে নামা সম্ভব নয়। এ নিয়ে খৃস্টানদের সাথে আলাপ করা দরকার। সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণের চিন্তা তো তারাও করছে।'

'এটা কি সম্ভব, আইয়ুবীর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে সালেহ যুদ্ধের ফয়সালা নেবে?' সহ-সেনাপতি বললো।

'হ্যাঁ, এটা সম্ভব!' কমাণ্ডার বললো, 'আমি সেখানে তার যে সব সেনাপতি ও কমাণ্ডারের সাথে আলাপ করেছি, তারা প্রায় সবাই বলেছে, আল মালেকুস সালেহ সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে সুলতানের সাথে প্রতারণা করেছে মাত্র। এটা স্রেফ ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। তার কোন সেনাপতি ও আমীরই চায় না, সালেহ এ চুক্তি মেনে চলুক। খৃস্টান উপদেষ্টারাও তাকে শীঘ্র আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছে।'

'তাহলে আপনার শীঘ্রই হলব চলে যাওয়া উচিত।' সহ-সেনাপতি বললো, 'আর আমি মুশেল চলে যাই।'

'তুমি আরো একবার হলব যাও!' সাইফুদ্দিন কমাণ্ডারকে বললো, 'আল মালেকুস সালেহকে গিয়ে বলো, আমি আসছি। তুমি আজ যাত্রা করলে আমি আগামী কাল রাতে রওনা করবো। এমনও হতে পারে, সে আমার সাথে নাও দেখা করতে পারে। হলব শহরের বাইরে আল মুবারক নামে যে ঝরণা ও উদ্যান আছে, সেখানে আমি ক্যাম্প করবো। আল

মালেকুস সালেহকে বলবে, ওখানেই সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। সে যদি আমার সাথে দেখা করতে না চায়, সে কথাও আমাকে তুমি আল মুবারকে এসে বলে যাবে।'

'ওখানে কি আপনার একা যাওয়া উচিত হবে?' কমাণ্ডার বললো।

'এ এলাকায় তো কোন ভয় নেই।' সাইফুদ্দিন বললো, 'আমি রাতে রওনা হবো। পথ চলবো সাধারণ বেশে। কেউ কি আর জানতে পারবে, তাদের সামনে দিয়ে মুশেলের আমীর যাচ্ছে!'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমাণ্ডো বাহিনী বড় হুশিয়ার।'

সহ-সেনাপতি বললো, 'সে ভয় নিয়ে তো আর ঘরে বসে থাকা যাবে না। ওভাবে ভাবলে তো বলতে হয়, তাদের থেকে আমরা কোথাও নিরাপদ নই।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।' সাইফুদ্দিন বললো, 'এটুকু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। তাহলে আজই তুমি মুশেল যাত্রা করো, ও রওনা হোক হলবে। আর আমি কাল রাতে হলব যাত্রা করছি।'

ওরা যখন এসব বলাবলি করছিল, হারেস ও দাউদ দরজার কান লাগিয়ে শুনছিল ওদের কথা। সাইফুদ্দিনের পুরো কর্মসূচীই জানা হয়ে গেল ওদের। দু'জনই সেখান থেকে সরে তাদের কামরায় চলে এলো। তারা গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো। দাউদকে তো সাইফুদ্দিনকে অনুসরণ করতেই হবে কিন্তু কি ভাবে করবে তাই সে ভাবছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর হারেসের মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। সে বললো,

'আমরা সাইফুদ্দিনের দেহরক্ষী সেজে তার সাথে হলব যাত্রা করতে পারি না! আমরা হঠাৎ তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হবো। আমার কথা তো তিনি জানেনই। তাকে বলবো, আমরা তার বাহিনীরই সৈনিক। যুদ্ধে পরাজয়ের পর এ ক'দিন এক জায়গায় লুকিয়ে থেকে আজ ফিরলাম। তারপর তিনি যখন রওনা করতে যাবেন, আমরা তাকে বলবো, আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের আমীরকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপত্তাহীনভাবে কোথাও যেতে দিতে পারিনা। আপনি যেখানেই যাবেন, আমরা আপনার দেহরক্ষী হিসাবে আপনার সাথে থাকবো।'

'যদি তিনি বলেন, তোমরা মুশেল চলে যাও, তখন কি করবে?' দাউদ তাকে প্রশ্ন করলো।

'তখন অন্য কোন কৌশল বের করতে চেষ্টা করবো।' হারেস বললো।

'যদি তোমার সে কৌশলও ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে?'

'তবে তিনিও হলব যেতে পারবেন না।' হারেস মুখমণ্ডল কঠিন করে বললো।

দাউদ বললো, 'তোমার প্রস্তাবটি মন্দ নয়। তবে এখনি সিদ্ধান্তে পৌঁছার দরকার নেই। তুমিও আরো একটু ভাবো, আমিও ভেবে দেখি।'

সে রাতেই সাইফুদ্দিন কামরার দরজা বন্ধ করে তার সহ-সেনাপতি ও কমাণ্ডারকে শেষ নির্দেশ দান করছিল।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হতে চললো, প্রথমে সেখান থেকে বিদায় নিল কমাণ্ডার। হারেসের বাবা তার ঘোড়া খুলে এনে তুলে দিল তার হাতে। একটু পর সহ-সেনাপতিও বিদায়

নিল। কামরায় এখন শুধু একা সাইফুদ্দিন গাজী।
সঙ্গীদের বিদায় করে সাইফুদ্দিন গাজী শুয়ে পড়েছিল। সহসা ভেতর দিকের দরজা জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললো কেউ। এমন জোরে আওয়াজ হলো দরজা খোলার, তিনি ভয় পেয়ে উঠে বসলেন। দেখলেন, ফৌজি খুশীতে বাগ বাগ হয়ে দৌড়ে আসছে। সাইফুদ্দিন সহাস্যে বললো, 'কি ব্যাপার ফৌজি! আনন্দে দেখি একদম আটখানা হয়ে গেছো!'
ফৌজি ছুটে সাইফুদ্দিনের পাশে গিয়ে তার দুই হাত চেপে ধরে বললো, 'ভাইয়া এসেছে! তার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছে!' ফৌজি খুশীতে ডগমগ করছিল।
সাইফুদ্দিনের চেহারা মুহূর্তে পাল্টে গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি তাদের বলে দিয়েছো, আমি এখানে আছি!'
'হ্যাঁ!' ফৌজি উত্তর দিল, 'আমি আপনার কথা বলতেই তারা তো আকাশ থেকে পড়লো। ভাইয়া আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলো না, বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আব্বা! তোমার মেয়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' আব্বা বললো, 'নারে বেটা, ওর মাথা খারাপ হয়নি। সত্যি, আল্লাহ্ আমাদের ঘরে এক সম্মানিত মেহমান পাঠিয়ে দিয়েছেন।' এ কথা শুনে ওরা তো মহা খুশী! ভাইয়া বললেন, 'যা তো ফৌজি, মেহমান যদি না ঘুমিয়ে থাকে, বলবি, ভাইয়ারা আপনাকে সালাম করার অনুমতি চাইছে।'
সাইফুদ্দিন অন্তরের পেরেশানী লুকিয়ে রেখে মুখে হাসি টেনে বললো, 'যাও, ওদের নিয়ে এসো।'

দাউদ ও হারেস আদবের সাথে সাইফুদ্দিনের কামরায়

উপস্থিত হয়ে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে দাঁড়ালো। সাইফুদ্দিন তাদেরকে ইশারায় পাশে বসতে বললো।
তাদের পরণে তখনো সামরিক পোশাক। চেহারায় ধূলোবালি ও পথশ্রমের ক্লান্তি। তারা সে ক্লান্তি লুকোবার চেষ্টা করে এক পাশে বসে পড়লো। হারেস বসতে বসতে বললো, 'আমি হারেস। আর ও আমার বন্ধু দাউদ।'
সাইফুদ্দিন হারেসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোন ব্যাটেলিয়ানে আছো?'
হারেস তার ব্যাটেলিয়ানের নাম বললো। সাইফুদ্দিন দাউদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আর তুমি?'
'আমি আপনার এক গোয়েন্দা কমাণ্ডো।' বলল দাউদ।
'তোমরা এতদিন কোথায় ছিলে?' সাইফুদ্দিন প্রশ্ন করলো।
'যুদ্ধের ময়দান থেকে সবাই যখন পালাচ্ছিল, আমাকে বলা হলো, 'আইয়ুবীর বাহিনীর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখো।' আমি ময়দান থেকে অনেক দূরে সরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আইয়ুবীর বাহিনীর গতিবিধি দেখছিলাম। আমাদের সৈন্যেরা পিছু হটে পালাচ্ছিল, হারেসও ছিল একটি দলের সাথে। আমি দূর থেকে হারেসকে দেখতে পেয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। ও বললো, 'চলো। লড়াই খতম হয়ে গেছে। আমাদের বাহিনী পিছু হটে এসেছে। কমাণ্ডার হুকুম করেছে, যেভাবে পারো আত্মরক্ষা করো। আমরা আবার সংগঠিত হয়ে ময়দানে আসবো।'
আমি ওকে বললাম, 'আমার যাওয়ার উপায় নেই। আইয়ুবীর বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার ডিউটি পড়েছে আমার। তুমি চলে যাও, আমি দুশমনের পিছু নেবো।'

হারেস বললো, 'যুদ্ধ তো শেষ। এখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কাজ নেই। তারচে এক কাজ করি, আমিও থেকে যাই তোমার সাথে। তারপর আমরা দু'জন পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ওদের দেখতে লাগলাম। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা হারান ও মুশেলের সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করার পরিবর্তে হলবের সৈন্যদের পিছু নিল। ময়দান ফাঁকা হয়ে গেলে ওরাও যাত্রা করলো হলবের দিকে। আমরা সতর্কতার সাথে ওদের পিছু নিলাম। আপনার হয়তো স্মরণ হবে, আপনি খৃস্টান উপদেষ্টাদের দিয়ে আমাদের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সে প্রশিক্ষণ আমাদের খুব কাজে লেগেছে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যবাহিনী সামনে এগিয়ে চললো। আমাদের সাথে আরো কিছু কমাণ্ডো থাকলে আমরা চোরাগুপ্তা কমাণ্ডো হামলা চালিয়ে ওদের অনেক ক্ষতি করতে পারতাম।'

দাউদ বললো, 'আমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে অনুসরণ করে তুর্কমান পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে তার সেনাবাহিনী ক্যাম্প করে অগ্রাভিযান মুলতবী করলে আমরা ফিরে এসেছি। মুশেল যাচ্ছিলাম আমরা। আপনাকে না পেলে এতক্ষণে হয়তো আবার পথে নেমে যেতাম। এখন আমাদের জন্য আপনার হুকুম কি? আমরা কি এখানে আপনার সাথে থাকবো, নাকি মুশেল গিয়ে রিপোর্ট করবো?'

সাইফুদ্দিন এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'তুর্কমানে আইয়ুবীর সৈন্যেরা যে ক্যাম্প করেছে তাতে কি

মনে হয়, তারা সেখানে সাময়িক যাত্রা বিরতি করেছে, নাকি দীর্ঘদিন থাকবে?'

'না, সাময়িক বিরতি নয়, দেখে মনে হয় ওরা ওখানে বেশ কিছুদিন থাকবে।'

হারেস বললো, 'মুহতারাম আমীর! পরাজয়ের কারণে আমার খুব দু:খ ও আফসোস হচ্ছে। আমাদের সৈন্যরা আর কিছুক্ষণ ময়দানে টিকে থাকতে পারলে এ পরাজয়ের গ্লানি এবার আইয়ুবীকেই ভোগ করতে হতো। একেই জিজ্ঞেস করুন, শক্রদের যা লাশ দেখেছি তা কয়েক শত নয়, কয়েক হাজার হবে। আর আহতদের সংখ্যার তো কোন হিসেবই নেই। তুর্কমান থেকে ফেরার আগে আমরা খুব সাবধানে গভীর রাতে তাদের ক্যাম্পের একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। হায় আল্লাহ! আহতদের চিৎকার সহ্য করা যায় না। চিৎকার শুনে মনে হলো, তাদের অর্ধেক সৈন্যই আহত।'

হারেসের কথা শেষ না হতেই দাউদ বলে উঠলো, 'আমীরে মুহতারাম! আল্লাহ আপনার ভাগ্য সু-প্রসন্ন করুন! আপনিই ভাল জানেন এখন কি করতে হবে। আমরা আপনার চাকর, যে আদেশ করবেন আমরা তাই পালন করবো। আমার ধারণা, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহিনী এখন আর যুদ্ধ করার মত অবস্থায় নেই। আপনি যদি আপনার সৈন্য একত্রিত করে জলদি তাদের ওপর আক্রমণ করেন, তবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আপনি এবার দামেশকে ফেরত পাঠাতে পারবেন।'

আমীর সাইফুদ্দিন হারেস ও দাউদের কথা অতি মনোযোগের সাথে শুনছিল। এমন কথা শোনার জন্য প্রাণটা যেন তার তৃষ্ণার্ত হয়েছিল। সাইফুদ্দিন ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পরাজিত সৈন্যদের একত্রিত করা কি সম্ভব?'

দাউদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'মুতারাম আমীর! আমাদের পরাজয় হয়নি, সম্মিলিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়েছে মাত্র।'

দাউদের এ কথায় তার মনে প্রশান্তি নেমে এলো। দুর্বলতা কাটিয়ে সবল হয়ে উঠতে লাগলো তার মন। যুদ্ধের পর এই প্রথম তার মনে স্বস্তিবোধ ফিরে এলো।

'আমরা মুশেল যাচ্ছিলাম।' দাউদ বললো, 'হারেসের গ্রাম রাস্তায় পড়ায় হারেস বললো, 'এসো বাড়ীর সবাইকে একটু দেখেই যাই।' এখানে আমাদের জন্য এমন সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে, তা আমাদের জানা ছিল না। একেই বলে ভাগ্য! আমরা যেন তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এ খবর পৌঁছাতে পারি, এ জন্যই হয়তো কুদরত এখানে আমাদের নিয়ে এসেছে। নইলে এ সংবাদ পেতে আপনাকে আরো অন্তত দু'দিন অপেক্ষা করতে হতো।'

হারেস বললো, 'ফৌজি যখন বললো আপনি এখানে আছেন, আমরা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। এখনো আমার বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না, সত্যি কি আমরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি? নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর বড় রকমের দয়া, তাঁর অপার মেহেরবানী।'

'আমি তোমাদের কথা শুনে খুবই খুশী হয়েছি।' সাইফুদ্দিন

ঠিক রাজার মত ভাব-গম্ভীর স্বরে বললো, 'তোমাদের এ বীরত্বের পুরস্কার তোমরা অবশ্যই পাবে।'
'আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে যে, আমরা আপনার পাশে বসেছি, আপনার সঙ্গে কথা বলছি।'
হারেস বললো, 'আমাদের জন্য সবচে বড় পুরস্কার হচ্ছে, আপনার জন্য জীবন দিয়ে আত্মার সন্তুষ্টি লাভ করা।'
'এখানে আপনার সাথে আর কে আছে? কোন ফৌজ কি সঙ্গে আছে আপনার? তারা কোথায়?' প্রসঙ্গ পাল্টে প্রশ্ন করলো দাউদ।
'এখানে এখন আমি একাই আছি। আমার সাথে সহ-সেনাপতি ও আরেক কমাণ্ডার ছিল। তারা দু'জনই যার যার কাজে চলে গেছে।' সাইফুদ্দিন বললো, 'আমিও চলে যাবো।'
হারেস সঙ্কোচ জড়িত কণ্ঠে বললো, 'আমি আপনার কাছে খুবই লজ্জিত যে, আপনাকে এমন নোংরা ও নিকৃষ্ট কামরায় থাকতে হচ্ছে। আপনি মেঝেতে বিছানা পেতে থাকছেন, এ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'
'আরে এতে তোমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আমি তো এমন একটি সাধারণ কুঁড়েঘরই তালাশ করছিলাম। ভাগ্য ভাল যে, আমি আমার পছন্দ মত যে ঘরটি খুঁজে পেয়েছি তা আমার খুব আপন লোকদের। আত্মগোপন করার জন্য এমন পরিবেশেরই দরকার ছিল।' সাইফুদ্দিন বললো, 'এখানকার সবাই খুব বিশ্বস্ত। ফৌজি তো আমার আপনজনই হয়ে গেছে। তোমরা শুধু খেয়াল রাখবে, যতক্ষণ এখানে আছি, কেউ যেন আমার এ আত্মগোপনের কথা জানতে না পারে।'
'আপনি বলছিলেন, আপনি কোথাও চলে যাবেন। কোথায়

যাচ্ছেন আপনি?’ দাউদ প্রশ্ন করলো।
‘আমি হলব যাবো।’ সাইফুদ্দিন উত্তর দিল, ‘সেখান থেকে মুশেল ফিরে আসবো।’
‘কিন্তু আপনি তো একা! যাবেন কেমন করে?’ দাউদ বললো, ‘আপনার সঙ্গে তো দেখছি কোন দেহরক্ষীও নেই?’
‘এ এলাকায় তেমন কোন ভয় নেই।’ সাইফুদ্দিন বললো, ‘একাই যেতে পারবো।’
‘আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।’ দাউদ বললো, ‘এ এলাকায় দুশমনের চর নেই এমনটি মনে করবেন না। আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ আপনাকে চিনে ফেললে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। খোদা না করুন, এমন কিছু ঘটে গেলে নিজেদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না। চিরকাল এ জন্য আমাদের আফসোস ও অনুতাপ করে কাটাতে হবে।’
‘ঘটনাক্রমে আল্লাহ যখন আমাদের এখানে পৌঁছেই দিয়েছেন, আমরা দু’জন আপনার সঙ্গী হই না কেন?’ হারেস বললো, ‘আমাদের দু’জনের সাথেই ঘোড়া আছে, অস্ত্র আছে। আপনার হেফাজতের জন্য অন্তত দু’জন দেহরক্ষী তো আপনি সাথে পাচ্ছেন। কোন আমীর কি এমনভাবে রক্ষীবিহীন একা বাইরে বেরোতে পারে?’
সাইফুদ্দিনও মনে মনে এ কথাই ভাবছিল। আসলেই তার দেহরক্ষীর প্রয়োজন ছিল। এমনিতেই পরাজয়ের পর তার

মধ্যে আইয়ুবীর ভয় কাজ করছিল, তার ওপর দাউদ তাকে আরো ভীত করে তুলল। সাইফুদ্দিন তাদের বললো, 'তোমরা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে নাও। আগামীকাল রাতে আমরা রওনা করবো। তোমরা ক্লান্ত, যাও, এখন গিয়ে একটু আরাম করো।'
তারা দু'জন উঠে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে স্যালুট করলো সাইফুদ্দিনকে, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। সাইফুদ্দিন ফৌজির কথা কল্পনা করতে করতে নিজেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।
পরদিন সাইফুদ্দিন ফৌজির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু ফৌজি সে কামরাতে আর গেল না। দিনের বেলায় হারেস ও দাউদই ব্যস্ত রইল তার খেদমতে। তারাই তার খাবারের ব্যবস্থা করলো এবং সারাক্ষণ তার পাশে বসেই কাটিয়ে দিল। সাইফুদ্দিন ভাবলো, হারেস ও দাউদ কামরায় আছে বলেই ফৌজি আসতে লজ্জা পাচ্ছে। এ কথা মনে হতেই তার পেরেশানী কিছুটা কমলো, কিন্তু কল্পনায় সারাক্ষণই ভাসতে লাগলো ফৌজির ছবি।

সাইফুদ্দিন গাজী যখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতির কথা চিন্তা করছিল অখ্যাত এক পর্ণকুটিরে শুয়ে, ঠিক সে সময় হলবের অদূরে খৃস্টান কমাণ্ডার, সেনাপতি ও সম্রাটরা এক কনফারেন্সে বসে আল মালেকুস সালেহ, গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের

কারণ অনুসন্ধান করছিল। সুলতান আইয়ুবীর মোকাবেলা করতে গিয়ে এ বিশাল বাহিনী কি করে পরাজিত হলো তখনো এর কোন কারণ তাদের বুঝে আসছিল না।

'এ তিন মুসলমান আমীরের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় আসলে আমাদেরই পরাজয়।' রিমাণ্ড বললো, 'যতদূর আমি জানি, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শক্তি ও সৈন্য সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।'

'আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না।' প্রসিদ্ধ ফরাসী সম্রাট রিনাল্ট বললো, 'যদিও আমাদের উদ্দেশ্য মুসলমানরা আপোসে মারামারি করুক আর তাদের একটা দল আমাদের হাতের পুতুল হয়ে যাক, কিন্তু তার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য আমাদের কঠিন ও জঘন্যতম দুশমন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিনাশ। আমরা চাই, তার পথে মুসলমানরাই প্রধান বাঁধা হয়ে থাক। তারাই তার শক্তি নষ্ট করুক। তাতে যদি আমাদের তল্পিবাহক মুসলমান শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না। আমি চাই, তারা সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করুক, আর এর জন্য যতদিন প্রয়োজন, তাদেরকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

'মুসলমান এলাকায় আমাদের প্রেরিত তাদের যে সব উপদেষ্টারা আছে, তাদের দেয়া রিপোর্টগুলো আমি আপনাকে শোনাতে চাই।' এক কমাণ্ডার বললো, 'তারা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ করার শক্তি ও মনোবল একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

ব্যাপক জীবনের ক্ষতি, অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র ময়দানে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে তারা। এ মুহূর্তে যুদ্ধ করার কোন অবস্থা ওদের নেই।'

'আমি জানি।' বললো আরেক সম্রাট, 'শুনেছি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তুর্কমানের মনোরম অঞ্চলে ক্যাম্প করে বসে আছে। তারও এখন অভিযান শুরু করার মত অবস্থা নেই। আমাদের উপদেষ্টারা সম্মিলিত বাহিনীকে বুঝানোর চেষ্টা করছে, তারাই যেন আইয়ুবীকে আগে আক্রমণ করে। আমি আশা করি, তারা যতি দ্রুত সংগঠিত হয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে, তবে এ ধাক্কায় আইয়ুবীর ধ্বংস অনিবার্য।'

'যদি এ পদ্ধতি সফল না হয়।' আগাস্টাস বললো, 'কারণ আইয়ুবী কখনো অসতর্ক থাকে না। তার গোয়েন্দা বাহিনী সব সময় চারদিকে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখছে। তার কাছে আক্রমণের খবর আসন্ন ঝড়ের সংবাদেরও আগে পৌঁছে যায়। আমাদের উপদেষ্টাদের বলা দরকার, তারা যেন সবকিছুর আগে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করে। প্রয়োজনে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হোক। তাদের ওপর হুকুম জারি করা হোক, যেন তারা সর্বত্র চরকির মত ঘুরে বেড়ায়। সংবাদ সংগ্রহ করা ছাড়াও তাদের কাজ হবে, আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের অপহরণ করা। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের আগে এসব গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোরা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়বে। যেখানেই কোন সন্দেহজনক লোক পাবে,

সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করবে। এমনকি কোন পথচারীও এ অভিযানের খবর যেন আইয়ুবীকে পৌঁছাতে না পারে, সে জন্য দরকার হলে তাদেরও গ্রেফতার করবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। সুলতান আইয়ুবী যেন আমাদের তৎপরতার কোন সংবাদ না পায়, সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এ গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারলেই কেবল সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আরো একটি বিষয়, ওরা যেমন প্রতিপক্ষের রসদ ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য কমাণ্ডো অভিযান চালায়, সম্মিলিত বাহিনীকেও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তারা আইয়ুবীর তাঁবুতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেবে, অপ্রস্তুত সৈন্যদের হত্যা করবে নির্মমভাবে। সম্মিলিত বাহিনী হাত বাড়ালেই রসদ পাবে, কারণ তারা যুদ্ধ করছে নিজের দেশে, কিন্তু আইয়ুবীকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় সুদূর কায়রো ও তার বিজিত অঞ্চল থেকে। তাই তাকে পরাজিত করার চাইতেও সম্মিলিত বাহিনীর নজর থাকবে তার রসদ ও অস্ত্র ভাণ্ডারের দিকে। এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে হবে, যাতে সে অসহায় হয়ে যায়।'

'আমি আপনার কথার বিরোধিতা করছি না। তবে আমাদের জানা থাকা ভাল, এখন আর তাকে কায়রো থেকে রসদ আনতে হবে না। সংবাদ পেয়েছি, সুলতান আইয়ুবী বিজিত অঞ্চল থেকে সৈন্য ভর্তি শুরু করেছে। লোকেরা স্বত:স্ফূর্তভাবে তার সেনাদলে ভর্তি হচ্ছে। এ তথ্য সত্য হলে

রসদ সে বিজিত অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করতে পারবে।'

এ কথা শুনে এক কমাণ্ডার বলে উঠলো, 'তার এ সৈন্য ভর্তির গতি বন্ধ করতে হবে। আর তার একটাই পথ, সেখানে জলদি আক্রমণ করা। নইলে যত সময় পাবে ততই সে এ সুযোগ গ্রহণ করবে।'

'আরো একটা পথ আছে।' বললো আরেক সেনাপতি, 'এ সুযোগে আমাদের কিছু গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোকে আইয়ুবীর বাহিনীতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারা সেখানে কৌশলে ভীতি, সন্দেহ, সংশয়সহ নানা অপঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে পারবে। এতে আইয়ুবীর বাহিনীর মধ্যে যে অটুট দৃঢ়তা আছে তাতে ধ্বস নামবে।'

অগাস্টাস বললো, 'আমি তোমাদের আরো একটি পথের সন্ধান দিতে পারি। সেখানে চরিত্র নষ্ট ও লোভ লালসার মিশন চালাতে হবে। মিশরে আমরা এ মিশনের আশাতীত সফলতা পেয়েছি।'

'কিন্তু এ মিশন তো খুব বিপদজনক। আমাদের দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদেরও হারানোর ভয় আছে। ধরা পড়লে ওরা কেউ জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

'ভয় আছে বলে কি আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো? যুদ্ধের সময় আমাদের সৈন্যরা মারা যায় না! আমরা তো তাদেরকে এ জন্যই লালন পালন ও প্রশিক্ষণ দেই, যাতে প্রয়োজনের সময় তারা আমাদের স্বার্থে জীবন বিলিয়ে দিতে পারে। এটুকু ঝুঁকি ও কোরবানী আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।'

অগাস্টাস বললো, 'কয়েকটা মেয়ে কেন, ক্রুশের জন্য আমাদের নিজেদের জীবনও দান করতে হবে। প্রয়োজনে সন্তানদেরও জীবন দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। তারপরও মুসলমানদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ওপর আঘাত করতে হবে আমাদের।'

সম্রাট রিনাল্ট বললো, 'আপনাদের প্রতিটি পরামর্শই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। মিশরে তিনি তার ক্ষমতা দৃঢ় করে রেখেছেন। আবার এখানে এসেও ক্ষমতা বিস্তার করে চলেছেন। তার সফলতার মূল কারণ, তিনি অসাধারণ সমর নায়ক, রণাঙ্গনের কুশলী উস্তাদ। দ্বিতীয় কারণ, তিনি ত্বরিত ব্যবস্থাপনায় নিপূণ, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসম্ভব দক্ষ। তৃতীয় মৌলিক কারণ হলো, তিনি তার সৈন্যদের মাঝে ইসলামী জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে সর্বাধিক সফল ব্যক্তিত্ব। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের ঈমানী দায়িত্ব বা ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে। ফলে তার কমাণ্ডোরা আমাদের ওপর নেকড়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ বিশ্বাস ও উন্মাদনা তাদের মধ্যে থেকে বিদায় করতে হবে।'

'আমরা সব সময় ওদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছি। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আমরা ওদের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি ও বিলাসিতা ঢুকিয়ে দিয়েছি।' শাহ অগাস্টাস বললো, 'যে মুসলমানের কাছে ধন-সম্পদ আছে সে আমীর হতে চায়। যে আমীর আছে সে বাদশাহ হতে চায়। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সে তার আদর্শ ও বিশ্বাস জলাঞ্জলী দিতেও পিছপা হয় না। আমাদের কোন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই।'

অন্য এক সেনাপতি বললো, 'আমাদের আরেকটি মিশন চালু করতে হবে। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও ঘৃণা ছড়াতে হবে। তার এমন সব জঘন্য দুর্ণাম ছড়াতে হবে, যা শোনা মাত্রই মানুষের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এ কাজ আমরা করতে পারবো না, বরং মুসলমানের কারো মুখ দিয়ে এ অপবাদ ছড়াতে হবে।'

'হ্যাঁ, এ অপবাদ আরোপও ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে। সবাই বিশ্বাস না করলেও কিছু লোক তো বিভ্রান্ত হবে! বাকীরাও সন্দেহের ঘোরে পড়বে।'

'এ সময় নিজেদের যুদ্ধ প্রস্তুতিও অব্যাহত রাখতে হবে।' এক কমাণ্ডার বললো।

সম্রাট অগাস্টাস বললো, 'সে তো অব্যাহত আছেই। তোমাদের প্রস্তুতির জন্য তো অনেক সময় পাইয়ে দিলাম। আমি যদি কৌশল করে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লোভ এবং লালসার ব্যাধি প্রবেশ করিয়ে না দিতাম এবং তারা একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হতো, তবে এতদিনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ফিলিস্তিনে থাকতো। আমরা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের জাতিকেই তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু আমি খুবই বিস্মিত এ জন্য যে, সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা যেমন মুসলমান, আমাদের মিত্র বাহিনীর সৈনিকরাও তেমনি মুসলমান। কিন্তু আইয়ুবীর সৈন্য একজন দশজনের সমান ভারী হয়ে দেখা দেয়।' সম্রাট রিমাণ্ড বললো, 'এরাও তো এক সময় সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য দলেই ছিল। তাহলে এখন কেন সবাই পালিয়ে যায়! কেন সুলতানের বাহিনীর

কাছে মার খেয়ে পরাজিত হতে হয় ওদের!'

'এটা বিশ্বাস ও আদর্শের কেরামতি, যাকে মুসলমানরা ঈমান বলে।' সম্রাট রিনাল্ট বললো, 'যে সৈন্য বা সেনাপতি তার এ ঈমানকে নিলামে বিক্রি করে দেয়, তার আর যুদ্ধ করার মনোবল থাকে না। তার কাছে তখন পরিশ্রমের মূল্য ও জীবনটাই প্রিয় হয়ে উঠে। এ জন্যই আমাদের মিশনারী তৎপরতা জোরদার করা প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্যে যৌন উন্মাদনা ও নেশার অভ্যাস গড়ে তোল, তখন আর তাদের সৈন্য ও ঘোড়া ধ্বংস করার প্রয়োজন থাকবে না।'

এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, 'তিন মুসলমান আমীরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সম্মিলিত বাহিনীকে আবার আইয়ুবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে একক কমাণ্ডের অধীনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে হবে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য জরুরী ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। তাদেরকে এক কমাণ্ডে রাখা হবে ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু মত পার্থক্য ও বিভেদ জিইয়ে রাখা হবে, যেন প্রয়োজনের সময় আবার তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়।

রাতের প্রথম প্রহর অতীত হয়ে গেছে। গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে হারেসদের গ্রাম। বাড়ীর পেছনের আস্তাবল থেকে তিনটি ঘোড়া বের করা হলো। একটির উপরে আমীর সাইফুদ্দিন গাজী, দ্বিতীয়টির ওপর হারেস ও তৃতীয়টির ওপর চড়ে বসলো দাউদ। দাউদ ও হারেস দু'জনের হাতেই বর্শা।

বর্শা তারা ফৌজি কায়দায় সমুন্নত করে রেখেছে।
তাদেরকে বিদায় জানাতে হারেসের বাবা, বোন ও স্ত্রী দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো। ফৌজির বাবার হাতে মশাল। সাইফুদ্দিন তাকিয়েছিল ফৌজির দিকে। ফৌজি অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল দাউদকে।
রওনা করলো ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে ফৌজি, তার ভাবী ও বাবা এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'খোদা হাফেজ!'
'খোদা হাফেজ!' বলে ওরাও ঘোড়ার পাছায় লাথি কষলো।
দেখতে দেখতে তিন অশ্বারোহী রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ফৌজি দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের অশ্বখুরধ্বনি শুনতে লাগলো। শব্দ যত দূরে যেতে লাগলো, ফৌজির কানে দাউদের বলা কথাগুলো আরো উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগলো। তার কানে বাজতে লাগলো, 'সত্য পথের সৈনিক ও যাত্রীদের বিবাহ উৎসব হয় আকাশে। তাদের বরযাত্রীরা পথ চলে ধুমকেতুর রাস্তা ধরে। আকাশের তারকারাজি তো সেই উৎসব-আনন্দেই হেসে উঠে আলো ছড়ায়!'
সে যখন ভেতরে গিয়ে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লো, তার কানে দাউদের সেই শব্দ তখনো গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো। শুয়ে শুয়ে সে দাউদের কথাই ভাবছিল। সহসা তার মনে হলো, 'আচ্ছা, আমি কি সত্যি দাউদকে ভালবেসে ফেলেছি। সেও কি ভালবাসে আমাকে। ও কি আমাকে বিয়ে করবে?'
বিয়ের কথা মনে হতেই একরাশ লজ্জা এসে ঘিরে ধরলো তাকে।
তার মনে আবার উদয় হলো দাউদের কথা। দাউদের

সকালের বলা প্রতিটি কথা তার অন্তরে যেন গুঞ্জন করতে লাগলো। মনে হলো দাউদ তাকে বলছে, 'সামনে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের নদী। এ নদীতে কোন সাঁকো নেই। আমাকে এ নদী পার হতে হবে সাঁতরে। যদি তুমি আমার চির সঙ্গী হতে চাও, তবে আমাদের কাবিননামা লিখতে হবে রক্তের কালিতে।'

এ কথা মনে হতেই তার মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠলো। মনে হলো সে রক্তের প্রবাহিত স্রোতের ওপর শুয়ে আছে। বিয়ের চিন্তা তার মাথা থেকে দূর হয়ে গেল। মনে হলো, এতক্ষণ ধরে একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ভাবছে সে। মুজাহিদের চোখের সামনে কখনো বিয়ের দুলহীন থাকে না। তার সামনে থাকে দুশমনের নেযা ও তলোয়ার। থাকে রক্তাক্ত বর্শার ফলা, ছুটন্ত তীরের শনশন আওয়াজ।

সাইফুদ্দিন ও তার রক্ষীরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেল। তারপর এক পাহাড়ের পাদদেশে নিরিবিলি জায়গা দেখে ক্যাম্প করে বাকী রাতটুকু তারা সেখানেই কাটিয়ে দিল। যখন সকাল হলো, সাইফুদ্দিন বললো, 'চলো, আবার রওনা করা যাক।'

ওরা আবার পথে নামল। আগে আগে চলতে লাগালো সাইফুদ্দিন। দাউদ ও হারেস বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে পেছনে যাচ্ছিল। ওরা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। সাইফুদ্দিনের কানে গিয়ে পৌঁছতে পারছিল না তাদের কোন কথা। উল্টো বাতাস ও ঘোড়ার পদ শব্দের আড়ালে সব হারিয়ে যাচ্ছিল।

'জানি না তুমি কেন আমাকে বাঁধা দিচ্ছ?' হারেস বিরক্ত হয়ে

বললো, 'এখানে তাকে হত্যা করে তার লাশ কোথাও গোপন করে দিলে কে আমাদের সন্দেহ করবে?'

'তাকে মেরে আমি তার পুরো বাহিনীকে বাঁচিয়ে দিতে চাই না। বরং তাকে জীবিত রেখে আমি তার সমগ্র বাহিনীকে ধরতে চাই।' দাউদ বললো, 'একে হত্যা করলে তার বাহিনীর কমাণ্ড অন্যজন গ্রহণ করবে। তার মত তারাও আবার খৃস্টানদের পোষা কুকুর হয়ে কামড়াতে আসবে আমাদের। তুমি নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখো, সময় মত তার ফয়সালা আমরা অবশ্যই করবো।'

দুপুরের আগেই তাদের চোখে হলবের মিনার ভেসে উঠলো। হলবের অদূরেই আল মুবারকের সবুজ প্রান্তর, প্রান্তরের পাশে প্রাকৃতিক স্রোতস্বিনী ঝর্ণাধারা।

ওরা ঝর্ণাধারার কাছে পৌঁছলো। সাইফুদ্দিনের সেই কমাণ্ডার যাকে চিঠি দিয়ে আগেই আল মালেকুস সালেহের কাছে পাঠানো হয়েছিল, দৌড়ে এসে বললো, 'আল মালেকুস সালেহ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

সাইফুদ্দিন আল-মুবারকের সবুজ প্রান্তরে প্রবেশ করলো। আল মালেকুস সালেহের দুই সেনাপতি তাকে স্বাগত জানিয়ে সামরিক কায়দায় স্যালুট করলো। সাইফুদ্দিন তাদের বললো, 'আমি এ ঝর্ণাধারার পাশেই ক্যাম্প করতে চাই।'

সাইফুদ্দিনের ইচ্ছামত সেখানেই তার জন্য ক্যাম্প স্থাপন করলো হারেস ও দাউদ। কিন্তু সাইফুদ্দিন কেন আল মালেকুস সালেহের মহলে যাওয়া পছন্দ করেনি এর কোন

কারণ আজো ইতিহাস বলতে পারেনি।
দাউদ ও হারেস তার সঙ্গেই রইলো। তাদের জন্য মহল থেকে এলো উন্নতমানের খাবার ও প্রশস্ত তাঁবু। মহলের চারক-বাকর খানসামারাও এসে গেল তার সেবায়। মহলের মত করে সাজানো হলো তাবু। আল মালেকুস সালেহ্ তাকে কেল্লার ভেতর নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানালো। রাতের খাবারের পর সেখানেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো আইয়ুবী বিরোধী জোটের দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে।

সন্ধ্যা। সাইফুদ্দিন তার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে রওনা হলো আল মালেকুস সালেহের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। আল মালেকুস সালেহ মহল থেকে বাইরে এসে সাইফুদ্দিনকে অভ্যর্থনা জানালো। সাইফুদ্দিন অল্প বয়সী শাহজাদাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললো। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর দু'জনের মধ্যে কি কথা হলো সে খবর তারা দু'জন ছাড়া বাইরের আর কেউ জানতে পারলো না।
তবে দু'জন বর্ণনাকারী লিখেছে, সাক্ষাতের সময় কোলাকুলির পর সাইফুদ্দিন প্রথম কথা বললো তার চিঠি প্রসঙ্গে। বললো, 'তুমি আমার চিঠির উত্তর দাওনি কেন?'
আল মালেকুস সালেহ্ বিস্মিত হয়ে বললো, 'কি বলছেন আপনি! আপনার চিঠি পাওয়ার পরের দিনই তো আমি লিখিতভাবে তার জবাব দিয়েছি! তাতে আমি স্পষ্ট করে লিখেছিলাম, 'চুক্তি নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

আমি তো সন্ধি করেছি একটু প্রস্তুতির সুযোগ নেয়ার জন্য। চুক্তির মাধ্যমে আমি সুলতান আইয়ুবীকে প্রতারণার জালে জড়িয়েছি মাত্র।'

'তোমার কোন চিঠিই আমি পাইনি।' সাইফুদ্দিন বললো, 'আমি তো এ নিয়ে দারুণ পেরেশানীতে ছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছো। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে চুক্তি করে ধোঁকা দিয়েছো আমাদের।'

এ কথায় আল মালেকুস সালেহের বিস্ময় রূপান্তরিত হলো পেরেশানীতে। সঙ্গে সঙ্গে সালেহ তার এক সেনাপতি ডাকলো। বললো, 'গোয়েন্দা প্রধানকে এখনি আমার সাথে দেখা করতে বলো।'

তলব পেয়ে ছুটে এলো গোয়েন্দা প্রধান। সালেহ বললো, 'উনার চিঠির জবাবে আমি যে পত্র দিয়েছিলাম, সেটা কাকে দিয়ে পাঠিয়েছো! সে কাসেদ কি ফিরে এসেছে?'

গোয়েন্দা প্রধান ফিরে গেল কাসেদের সন্ধান নিতে। একটু পর হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো, তার চেহারায় উদভ্রান্ত দৃষ্টি। সালেহ বললো, 'কি ব্যাপার!'

'যে কাসেদকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, সে আর ফিরে আসেনি। রেকর্ড খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, তার কোন ঠিকানাও আমাদের দপ্তরে জমা নেই।'

স্বাভাবিকভাবেই এ সংবাদের পর সেখানে একটা হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল। কাসেদের আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কেউ বলতেও পারলো না, সে কোথাকার লোক। সে যেখানে

থাকতো, সেখানে তার বিছানাপত্র পড়ে আছে কিন্তু সে কোথাও নেই।
এ ঘটনার পর সবাই ধারণা করতে বাধ্য হলো, সে নিশ্চয়ই সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর কোন গোয়েন্দা ছিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি শেষ পর্যন্ত সুলতান আইয়ুবীর হাতে গিয়ে পড়লো!
এ ঘটনা যখন খৃস্টান উপদেষ্টার কানে গেল, তারাও বললো, 'কাসেদ সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমাণ্ডো ছিল। অথবা এমনও হতে পারে, কাসেদ চিঠি নিয়ে সাইফুদ্দিনের কাছে যাওয়ার পথে সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা তাকে ধরে চিঠি কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। এতে তাদের বুঝতে বাকী রইলো না, সুলতান আইয়ুবী তাঁর প্রস্তুতি আরো ত্বরান্বিত করবে। এমনও হতে পারে, তাদের আগেই তিনি আক্রমণ করে বসবেন।
সালেহ সাইফুদ্দিনের উপস্থিতিতেই গুমাস্তগীন ও খৃস্টান উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠালেন। সবকিছু বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, জলদি তিন বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান আইয়ুবীর ওপর চড়াও হতে হবে। খৃস্টানরা তো এটাই চাচ্ছিল। তারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ চালু রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মুশেল ও হারানে চিঠি পাঠানো হলো। চিঠিতে বলা হলো, 'পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেখানকার সৈন্যরা হলব অভিমুখে যাত্রা করে। তারা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই রওনা করতে হবে, প্রস্তুতির জন্য

সময় নেয়া যাবে না।'

বিশ্বস্ত কাসেদদের হাতে চিঠি দিয়ে বলা হলো, 'তোমরা এ চিঠি অনতিবিলম্বে হলব ও হারানে পৌছে দেবে।'

হারানের আমীর গুমাস্তগীন ভেতরে ভেতরে ইতস্তত: করছিল, কিন্তু সবার মাঝে বসে বিরোধিতা করার সাহস পেলো না। বৈঠকে এ সিদ্ধান্তও নেয়া হলো, 'তিনটি সেনা দলই একক হাইকমাণ্ডের অধীনে থাকবে আর এর সুপ্রিম কমাণ্ডে থাকবে সাইফুদ্দিন গাজী।'

গুমাস্তগীন তার বাহিনী হাইকমাণ্ডে যুক্ত করলো বটে তবে নিজে সাইফুদ্দিনের অধীনে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে বসলো। বললো, 'সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বাহিনী আমীর সাইফুদ্দিনের হাওলা করে দেবো। তবে আমি নিজে কারো অধীনে যুদ্ধ করতে পারবো না। এ অবস্থায় আমাকে অভিযান থেকে নিস্কৃতি দিয়ে হলবে থাকার অনুমতি দিতে হবে।' বৈঠক গুমাস্তগীনের এ অযাচিত আবদারও মেনে নিল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনটি সেনাদল হলবে সম্মিলিত হলো। খৃস্টানরা তাদেরকে সব রকম যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিল। তারা আরো সাহায্য দেয়ার অঙ্গীকার করে সৈন্যদলকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার তাগাদা দিল।

অতর্কিত আক্রমণের প্ল্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তিন বাহিনী। অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। রাতের বেলা পথ চলতো, দিনে কোথাও

গোপন স্থানে ক্যাম্প করে বিশ্রাম নিত। এ ছাড়া গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোদের রাস্তার ডানে ও বামে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, 'কোন মুসাফির চোখে পড়লে তাকে ধরে নিয়ে হলবে পাঠিয়ে দেবে।'

অভিযান নিয়ে বেরোনোর আগে সাইফুদ্দিন দাউদ ও হারেসকে কাছে ডাকলো। তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললো, 'নিদারুণ বিপদের সময় তোমরা আমাকে সঙ্গ দিয়েছো। তোমরা যে উপকার করেছো সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। যুদ্ধের পর ফিরে আমার প্রথম কাজ হবে তোমাদের পদোন্নতি ও পুরস্কার দেয়া।'

একটু চুপ থেকে কথা গুছিয়ে নিয়ে হারেসকে আবার বললো, 'তোমার বোনের জন্য আমার মাথার ওপর এক বোঝা চেপে আছে। আমি তার সামনে তখন যাবো, যখন আমি ওয়াদা পূর্ণ করে তার সামনে যাবার যোগ্য হবো।'

হারেসকে এ কথা শুনে বিস্মিত হতে দেখে সাইফুদ্দিন বললো, 'ফৌজি বলেছিল, সুলতান আইয়ুবীর তলোয়ার নিয়ে তার অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে যখন আমি তার সামনে যাবো তখন সে আমার সাথে যাবে। হারেস! আমি জয় লাভ করে ফিরে এলে, তোমার বোন মুশেলের রাণী হবে।'

'ইনশাআল্লাহ!' হারেস বললো, 'আমরা আপনাকে বিজয়ী করে আনবো। তিন বাহিনী কি তবে এক সাথেই যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ!' সাইফুদ্দিন উত্তর দিলো, 'আর আমি তিন বাহিনীর হেড অব কমাণ্ড।'

'জিন্দাবাদ!' দাউদ খুশী প্রকাশ করে বললো, 'এখন তো সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পালানোর পালা।'

দাউদ ও হারেস তাকে উৎসাহিত করার জন্য খুব আবেগের সাথে ফৌজির কথা বারবার বলে তার প্ল্যানের নকশাও জেনে নিতে লাগলো। সাইফুদ্দিন কিভাবে অভিযান চালাবে প্রশ্ন করে তার খুঁটিনাটি জেনে নিল।

'তোমরা এখন দু'জনই তোমাদের নিজ নিজ ব্যাটেলিয়ানে চলে যাও।' সাইফুদ্দিন বললো, 'এখন আমার রক্ষী দল এসে গেছে। আবারও বলছি, আমি তোমাদের দু'জনকে চিরকাল মনে রাখবো।'

তিনটি বাহিনী একত্রিত হয়ে রাতের অন্ধকারে যাত্রা করলো। দাউদ ও হারেস মুশেলের সেনাবাহিনীর একটি দলে ঢুকে পড়লো। হারেসকে সিপাইরা চিনতো। কারণ সে ওদের দলেরই ছিল। দাউদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হারেস বললো, 'মুশেলের আমীর তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছে। সে অন্য ব্যাটেলিয়ানে ছিল, এখন এখানে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আমীর।'

ফলে দাউদের পরিচয় নিয়ে কেউ আর প্রশ্ন তুলল না।

তিনটি বাহিনী সতর্কতার সাথে পথ চলতে লাগলো। মধ্যরাত। বাহিনী একটি পাহাড়ী এলাকায় এসে পড়ল। পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে সৈনিকদের লাইন ঠিক রাখা সম্ভব হল না। লাইন এলোমেলো হয়ে যেতেই দাউদ হারেসকে বললো,

'জলদি এখান থেকে বের হও। পালাবার এটাই উত্তম সময়!''
রাতের অন্ধকার ও এলোমেলো কাফেলার সুযোগে দু'জন তাদের ঘোড়াকে ধীরে ধীরে একদিকে সরিয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহিনী থেকে দূরে সরে গেল ওরা। দাউদ হারেসকে বললো, 'ভোর হলেই সম্মিলিত বাহিনী কোথাও ক্যাম্প করে রাত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। দিনে ওরা পথ চলবে না। আমরা সারাদিন পথ চললে রাতের মধ্যে তুর্কমান পৌঁছে যেতে পারবো। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আসন্ন হামলার খবর আমরা একদিন আগেই পৌঁছে দিতে পারবো। তখন সুলতান আইয়ুবী বুঝবেন, কিভাবে শত্রুদের স্বাগত জানালে উত্তম হবে।'
দাউদ তার পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিল। তার পরিপূর্ণ ভরসা ও আশা ছিল, এ অভিযানে সে অবশ্যই সফল হবে। কিন্তু তার জানা ছিল না, আশপাশের এলাকাগুলোতে সম্মিলিত বাহিনীর অজস্র গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোরা ছড়িয়ে আছে।
তারা দু'জনই বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডান দিকে বহু দূর চলে এসেছিল। যখন বুঝলো, তারা নিরাপদ স্থানে চলে এসেছে, তখন তারা দিক পরিবর্তন করে তুর্কমানের রাস্তা ধরলো।
এতক্ষণ তারা হালকা গতিতে পথ চলছিল, এবার অশ্বের গতি কিছুটা দ্রুততর করলো। হারেস বললো, 'গতি খুব দ্রুত করো না, কারণ আমাদের অবিরাম পথ চলতে হবে। ঘোড়াকে বেশী ক্লান্ত ও দুর্বল করা যাবে না।'

দাউদও তার সাথে একমত হলো এবং বিরতিহীনভাবে মধ্যম গতিতে এগিয়ে চললো। সারা রাত এভাবেই পথ চললো তারা। আস্তে আস্তে রাতের অন্ধকার ফিঁকে হয়ে এলো। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লো পাহাড়ী রাস্তায়।

দাউদ ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ের এক উঁচু চূড়ায় উঠে গেল। নিচে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হারেস। দাউদ চারদিকে দৃষ্টি বুলালো। কোথাও কোন জনমানব নেই। রাস্তায় কোন পথিক বা কাফেলা নেই। পেছনে অনেক দূরে ধূলোর আবছা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না তার। ধূলোর মেঘ দেখে আশ্বস্ত হলো সে, বাহিনী এখনো পথ চলছে ঠিকই, তবে তারা অনেক দূরে এবং একটু পরই তারা কোথাও লুকিয়ে পড়বে। ফলে অগ্রযাত্রা থেমে যাবে তাদের। কিন্তু হারেস ও দাউদ কোথাও থামবে না, ফলে বাহিনীর অনেক আগেই তারা তুর্কমান পৌঁছে যেতে পারবে।

কিন্তু তার জানা ছিল না, দুশমন গোয়েন্দা জালের মত ছড়িয়ে আছে তার চলার পথে। সে নিচে নেমে এলো। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দু'জনই আবার আগের গতি চলতে শুরু করলো।

অঞ্চলটি ছিল বালি ও পাথরে ভরা। কোথাও কোন সবুজ নেই, ঘাস বা বৃক্ষ নেই। নিরেট দুর্গম পাথুরে ভূমি।

দু'জন টিলার মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সামনে একটা মোড়। ওরা মোড়ের কাছে পৌঁছে যেই ঘোড়ার মুখ ঘুরালো, চারজন অশ্বারোহী বর্শা হাতে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

'অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামো।' এক অশ্বারোহী গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম করলো, 'আগে বলো, তোমরা কারা, কোত্থেকে এসেছো এবং কোথায় যাচ্ছো।'

'আমরা মুসাফির!' ঘোড়া থেকে না নেমেই বললো দাউদ।

'মুসাফির মুশেলের সেনা পোষাকে কোথাও যেতে পারে না।' অশ্বারোহী বললো, 'মুসাফিরের হাতে সেনাবাহিনীর অস্ত্র থাকে না, যেমন তোমাদের হাতে আছে। তোমরা যে কেউ হওনা কেন, তোমাদের হলব ফিরে যেতে হবে। আমরা তোমাদের আর এক কদমও সামনে বাড়তে দেবো না।'

এরা ছিল হলবের চার কমাণ্ডো। রাস্তায় সন্দেহজনক ব্যক্তি পেলে তাদেরকে ধরে হলবে নিয়ে যাওয়ার হুকুম ছিল ওদের ওপর। হলব থেকে তুর্কমান পর্যন্ত পুরো পথেই ছড়িয়ে ছিল এই কমাণ্ডো ও গোয়েন্দা বাহিনী।

অশ্বারোহী চারজন ওদের দু'জনকে ঘিরে ফেললো। দাউদ হারেসকে আস্তে করে বললো, 'সময় হয়ে গেছে ভাই।'

হারেস তার ঘোড়ার লাগামে ঝটকা মেরে টেনে ধরলো। ঘোড়া সামনের পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠলো। পা নামাতেই তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হারেস।

তার আগেই, ঘোড়া যখন লাফিয়ে উঠেছিল, হারেস সঙ্গে সঙ্গে সামনের লোকটির বুকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। আঘাতের ধকল সইতে না পেরে লোকটি নিচে পড়ে গেল। কিন্তু তার বাম পাশের লোকটি ততক্ষণে বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হারেসের ওপর। লোকটির বর্শা বিদ্ধ হলো হারেসের

কাঁধে। হারেস জবাবী হামলা করার পরিবর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

দাউদ ছিল কমাণ্ডো যোদ্ধা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আত্মরক্ষার কৌশল জানা ছিল তার। সে তার ঘোড়া ছুটানোর সাথে সাথে প্রতিপক্ষের একজনকে পিছন থেকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো ঘোড়ার সামনে। লোকটির দেহ পিষ্ট হয়ে গেলো ঘোড়ার পদতলে। হামলকারীরা ছিল চারজন, দু'জন এরই মধ্যে ধরাশায়ী হলেও বাকী দু'জন ছিল অক্ষত। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ওরা ধাওয়া করে ছুটল ওদের পেছনে।

হারেস ছিল আহত। সে ঠিক মত ঘোড়া ছুটাতে পারছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের ধরে ফেললো ধাওয়াকারীরা।

এ স্থানটা ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করার উপযুক্ত ছিল না। দু'দিকেই ছিল উঁচু টিলা। ঘোড়া লাফাতে ও চিৎকার করতে লাগলো। বর্শার সাথে বর্শার ঘর্ষণের কর্কশ আওয়াজ আচ্ছন্ন করে ফেলল হারেসকে। বেশীক্ষণ সে ওদের প্রতিরোধ করতে পারলো। উপর্যুপরি বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হারেস অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেল।

দাউদও এর মধ্যে আহত হয়েছে, আহত হয়েছে তার প্রতিপক্ষও। হারেস পড়ে যেতেই তার আহত প্রতিপক্ষ দাউদদের দিকে ফিরল। লড়াইয়ের অবস্থা তাদের অনুকূলে বুঝতে পেরে ছুটলো তাদের দিকে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল হারেস। হুশ

ফিরতেই দেখলো, যে বর্শাধারী তাকে আহত করেছিল, সে তাকে মৃত ভেবে এবার ছুটে যাচ্ছে দাউদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে যেন খোদায়ী শক্তি ভর করলো। সে তার বর্শাটি কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল ছুটন্ত দুশমনের দিকে। পথের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটি, আর উঠতে পারল না।

তখনো লড়াই হচ্ছে দাউদ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। দু'জনের অবস্থাই গুরুতর। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত উভয়ের দেহ। রক্তের ধারায় ভিজে গেছে পরণের পোষাক। তখনো একজন আরেকজনকে আঘাত করে চলেছে, কিন্তু সে আঘাতের সুস্পষ্ট টার্গেট কেউ ঠিক রাখতে পারছে না। এলোমেলোভাবে যেন অভ্যাসের বশে একজন আরেকজনকে আঘাত করে চলেছে। দাউদের ঠিক মনে নেই এরপর কি ঘটেছিল। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলো ছয়টি আহত ঘোড়া পাহাড়ের সংকীর্ণ কুচিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আরোহীদের রক্তাক্ত নিথর দেহগুলো পড়ে আছে পাথুরে মাটির ওপর।

দাউদ উঠে বসলো। লম্বা করে দম নিল কয়েকবার। ক্ষত থেকে তখনো গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। সে খঞ্জর বের করে জামা ছিঁড়ে কয়েক জায়গায় ব্যাণ্ডেজ করলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে।

যুদ্ধ শেষ। আহত রক্তাক্ত দাউদ তুর্কমানের পরিবর্তে হারেসের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো।

হারেসকে একনজর কাছে গিয়ে দেখার কথাও মনে এলো না

তার। সে ধরেই নিয়েছিল, চার কমাণ্ডোর মত হারেসও মারা গেছে। হয়তো একটুপর সে নিজেও মারা যাবে।

তখনি তার মনে পড়লো, দুশমন এসে পড়ার আগেই সুলতানের কাছে খবর পৌঁছানো দরকার। আর এ খবর পৌঁছাতে হলে তাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

তার শরীর থেকে এত বেশী রক্ত ঝরে গিয়েছিল যে, ঘোড়ার জ্বীন ও পিঠ ভিজে গিয়েছিল। সে অনুমান করে দেখলো, তুর্কমান অনেক দূর। তারচে হারেসের গ্রাম অনেক কাছে। তার লক্ষ্য হারেসের বাবা। একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ তার শহীদ সন্তানের আত্মার শান্তির জন্য তুর্কমান ছুটে গিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে সংবাদ দিতে রাজি হবে।

সে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাচ্ছিল। ঘোড়ার দোলা ও ঝাঁকিতে রক্ত ঝরা বেড়ে যাচ্ছিল। পিপাসায় শুকিয়ে আসছিল তার কণ্ঠ। চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। একটু পর পর সে মাথা ঝাঁকি দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। সে পথ চলছিল আর কোরআনের আয়াত পাঠ করছিল। মাঝে মাঝে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিল, 'হে আকাশ ও মাটির মালিক, দোহাই তোমার রাসূলের, তুমি আমাকে আর সামান্য কিছু সময় বেঁচে থাকার সুযোগ দান করো।'

ঘোড়া দ্রুত তালে দৌড়ে চলেছে। দাউদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। সে অনুভব করলো, মৃত্যু তার একদম

কাছে চলে এসেছে। তার সর্ব শরীর নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছিল। বার বার মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে নিজেকে সামলিয়ে নিচ্ছিল।

সে অনুভব করলো, হারেসদের বাড়ী আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু সে আর অশ্বপৃষ্ঠে বসে থাকতে পারছিল না। সে ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়লো, খামচে ধরলো ঘোড়ার পশম।

এ ভাবে এগিয়ে গেলো আরো কিছু পথ। ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখ দুটো। নিজকে সামলে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো দাউদ, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারলো না। এক সময় সে পায়ের তলায় মাটি অনুভব করলো। ধীরে ধীরে সুপ্তির অতলে হারিয়ে গেল সে, জ্ঞান হারাল দাউদ।

তার যখন হুশ হলো, অনুভব করলো, কেউ একজন তাকে ধরে রেখেছে। নিশ্চয়ই এখন রাত, অন্ধকার দূর করার জন্য পাশেই মশাল জ্বলছে।

সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করলো। তার কানে ভেসে এলো নারী কণ্ঠের আওয়াজ, 'দাউদ তুমি বাড়ীতে, ভয় পেওনা!'

নারী কণ্ঠটি চিনতে পারলো দাউদ। এ যে ফৌজির কণ্ঠ! সে অজ্ঞান অবস্থায় তাহলে এখানে এসে পৌঁছে গিয়েছিল! আল্লাহর দরবারে তার ফরিয়াদ তাহলে বৃথা যায়নি!

'বাবা কোথায়?' শুয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করলো দাউদ।

'তিনি বাইরে গেছেন!' ফৌজি বললো।

'কখন ফিরবেন?' দাউদের কণ্ঠে অস্থিরতা।

'তিনি কাল অথবা পরশু আসবেন।'
ফৌজি ও তার ভাবী ক্ষত ধুয়ে পরিষ্কার করছিল, পানি চাইলো দাউদ। ফৌজি মশক থেকে পানি ঢেলে ওর ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলো, কাত হয়ে পানি পান করে সে।
পানি খাওয়া হয়ে গেলে দাউদ নিঃসাড় হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রইলো ওভাবে। চোখ বন্ধ করে ভাবলো কিছুক্ষণ। এক সময় চোখ মেলে ফৌজির দিকে তাকিয়ে বললো, 'ফৌজি, তুমি বলেছিলে পুরুষের কাজ মেয়েরাও করতে পারে।' তার কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু সে কথা বন্ধ না করে বলতে লাগলো, 'আমার ক্ষত পরিষ্কার করার বৃথা চেষ্টা বাদ দাও। আমার শরীরে আর কোন রক্ত নেই। আমি যদি সুস্থ্য থাকতাম, তবে তোমার বাইরে যাওয়া আমি কিছুতেই সহ্য করতাম না। যা করার আমি নিজেই করতাম। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। আমি এখন যে কথা বলছি, এটা শুধু আমার ও তোমার নিজস্ব ব্যাপার নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের রাসূলে পাকের সম্মান। জড়িয়ে আছে জাতীয় মর্যাদা ও ইজ্জতের প্রশ্ন।'
'বলো দাউদ! তোমার আমার স্বপ্ন এক, আশা এক। জাতীয় কোন দায়িত্ব আমাকে দেয়ার কথা ভেবে থাকলে এটাকে আমি আমার পরম সৌভাগ্য মনে করবো। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের চাইতেও মহত, প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। জাতির কোন সেবা করার সুযোগ পেলে সে দায়িত্ব আমি প্রাণ দিয়ে পালন করবো।'

দাউদ ফৌজিকে তুর্কমানের রাস্তা বলে দিল। আর বললো, ‘একটু কাগজ নাও, আমি যা বলছি লিখে নাও।’

দাউদ ফৌজিকে দিয়ে একটি চিঠি লিখালো। তারপর সে চিঠিতে দস্তখত দিয়ে তুলে দিল ফৌজির হাতে। চিঠিতে লেখা ছিল, ‘হলব, হারান ও মুশেলের সম্মিলিত বাহিনী তুর্কমানে আক্রমণের জন্য হলব থেকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তারা যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তাতে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে তুর্কমানে চড়াও হয়ে যেতে পারে।’

চিঠিটি ফৌজির হাতে দিয়ে দাউদ বললো, ‘ফৌজি, এ চিঠির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তোমাকে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি, এ খবর পৌঁছানোর জন্যই আমার এ আহত ও রক্তাক্ত অবস্থা, এ ফরজ আদায় করতে গিয়েই শহীদ হয়ে গেছে তোমার একমাত্র সহোদর প্রিয় ভাই। দুশমন চড়াও হওয়ার আগেই এ চিঠি আইয়ুবীর কাছে পৌঁছাতে হবে। যাওয়ার পথে যদি দুশমন গোয়েন্দার হাতে ধরা পড়ে যাও, নষ্ট করে ফেলবে চিঠি। তারপর যদি ওদের হাত গলে বেরিয়ে যেতে পারো তবে সোজা তুর্কমানে গিয়ে সব কথা সুলতান আইয়ুবীর কাছে খুলে বলবে।’

ফৌজি প্রস্তুত হয়ে গেল, তার সাথে রওনা হলো হারেসের স্ত্রীও। একটা ঘোড়া বাড়ীতে ছিল, দ্বিতীয় ঘোড়াটি নিল দাউদের। কিন্তু দাউদকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে ভয় পাচ্ছিল ফৌজি ও তার ভাবী।

‘ফৌজি!’ দাউদ দুর্বল স্বরে বললো, ‘আমার কাছে এসো।’

ফৌজি যখন তার কাছে গেলো, দাউদ তার হাত ধরে বললো, 'সত্য পথের সৈনিক ও যাত্রীদের বিবাহ উৎসব হয় আকাশে। তাদের বরযাত্রীরা পথ চলে ধুমকেতুর রাস্তা ধরে। আকাশের তারকারাজি তো সেই উৎসব-আনন্দেই হেসে উঠে আলো ছড়ায়! তুমি ভেবো না, আমাদের বিয়ের আনন্দ-উৎসব আকাশের তারকারাজিই করবে।'

দাউদের জবান বন্ধ হয়ে গেল। একদিক ঢলে পড়লো তার মাথা। ফৌজি আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাকলো, 'দাউদ! দাউদ!' কিন্তু ততক্ষণে বর বেশে ধুমকেতুর পথে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে দাউদের। দুনিয়ার মায়া ছেড়ে তার আত্মা বিলীন হয়ে গেছে অসীম শূন্যতায়।

ফৌজিকে সব কিছুই বুঝিয়ে বলেছিল দাউদ। তার মৃত্যুর পর শোক যেন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সংকল্পে দৃঢ় হলো তার চোয়াল। বললো, 'ভাবী, দাউদ তার প্রভুর কাছে রওনা হয়ে গেছে। এখন আর তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। সে যে জিম্মাদারী দিয়ে গেছে আমাদের ওপর, আগে সে জিম্মাদারী পূরণ করতে হবে। চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।'

'কিন্তু তার লাশ!'

'লাশ এখানেই থাকবে। তার বান্দার লাশের ফয়সালা করবেন তার প্রভু। উদ্দেশ্যের জন্যই জীবন, উদ্দেশ্যের জন্যই মরণ। তার লাশের চাইতে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নই আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্যের কথা ভুলে লাশ নিয়ে পড়ে

থাকলে পাপ হবে ভাবী!'

বাড়ী এবং দাউদের লাশ আল্লাহর হাওলা করে ফৌজি ও তার ভাবী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ঘোড়ার ওপর জ্বীন এঁটে দু'জনে চড়ে বসলো দুই ঘোড়ার ওপর। ফৌজি চড়লো দাউদের ঘোড়ায়। ঘোড়ার জীনে তখনো লেগে আছে রক্ত।

তারা যখন ঘর থেকে বেরোয় তখন পৃথিবীর সৌন্দর্য ঢেকে দিয়েছিল রাতের অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই দু'টি ঘোড়া গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথে ঢুকে গেল। দু'জন নারী পথ চলছিল একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে। রাস্তাঘাট সবই তাদের অচেনা। নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে দাউদের এঁকে দেয়া নকশা অনুযায়ী ছুটে চললো ওরা। পথ হারাবার ভয় এবং পথের যাবতীয় বিপদ আপদকে তুচ্ছ করে অন্ধকার পথে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে দুই নারী।

তিন বাহিনীর যুক্ত কমাণ্ড সারাদিন ক্যাম্প করে শুয়ে থেকে রাতে আবার যাত্রা করলো। তুর্কমান এখন আর খুব বেশী দূরে নেই। আজ সারা রাত পথ চললে তুর্কমানের খুব কাছাকাছি চলে যাওয়া যাবে। কাল দিনের বেলা ইচ্ছে করলে হামলা করা যায়, কিন্তু সাইফুদ্দিন ভেবে দেখলো, যদি কালকের দিনটা কোন মতে গোপনে তুর্কমানের কাছে কোন পাহাড় কুচিতে কাটিয়ে দেয়া যায় সেটাই ভাল হবে। তাহলে রাতের অন্ধকারে অপ্রস্তুত অবস্থায় আইয়ুবীর ওপর অতর্কিত হমলা চালানো যাবে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এ বাহিনীর আগমন সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তার কোন গোয়েন্দা হয়তো এখনো এ বাহিনীর আগমন সংবাদ পায়নি অথবা যারা পেয়েছে তারা সবাই সম্মিলিত বাহিনীর গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।

কারণ যাই হোক, মূল কথা হচ্ছে, আইয়ুবী ওদের আগমন এখনো টের পাননি। তিনি তার বাহিনীর সৈন্যদের দেখাশোনা ও নতুন ভর্তি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। শত্রুরা যে আটঘাট বেঁধে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছে তাকে আঘাত করার জন্য, এমন কোন ধারনাও ছিল না আইয়ুবীর। তিনি তখনো ভাবছেন, শত্রুরা এত তাড়াতাড়ি সংগঠিত হতে পারবে না। সালেহ ও সাইফুদ্দিনের যোগাযোগের মাধ্যম যে চিঠি, সেই চিঠি তো এখন তারই হাতে!

সাইফুদ্দিন তার কমাণ্ডো বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, 'বরাবর আইয়ুবী গোয়েন্দা তৎপরতায় আমাদের থেকে এগিয়ে থাকে। তার সাফল্যের এটা অন্যতম কারণ। যুদ্ধে জিততে হলে এবার প্রথম থেকেই জিততে হবে। আমাদের আগমনের খবর যেন আইয়ুবী না পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।'

সাইফুদ্দিন আরো বললো, 'তুর্কমানের আশেপাশে এমন লোকও দেখা যাবে, যারা গ্রাম্য পোষাকে এবং ভবঘুরে ও দিনমজুরের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা ভবঘুরে, দিনমজুর বা

গ্রাম্য লোক নয়, ওরা সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা। আইয়ুবীর পক্ষে রাস্তা দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত আছে ওরা। এ ধরনের লোকদেরও পাকড়াও করে হলবে পাঠিয়ে দেবে, যাতে আইয়ুবী আমাদের অভিযানের খবর কিছুতেই জানতে না পারে।'

সাইফুদ্দিন গাজীর এ সতর্কতার কারণে জীবনে এই প্রথম সুলতান আইয়ুবী প্রতিপক্ষের আগমন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলেন। এ বাহিনী যেভাবে এগুচ্ছে, যদি শেষ পর্যন্ত সুলতান আইয়ুবীকে অন্ধকারে রেখে তারা আইয়ুবীর অপ্রস্তুত বাহিনীর ওপর সত্যি আঘাত হানতে পারে, তবে আইয়ুবীর আসলেই নিষ্কৃতির কোন পথ নেই।

ফৌজি ও তার ভাবী পাগলিনীর মত ছুটতে ছুটতে রাত পার করে দিল। ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি, ভয় কোন কিছুরই বোধ ছিলনা ওদের। ওরা ছুটছে তো ছুটছেই। এভাবে ছুটতে ছুটতেই ওরা সারারাত ঘোড়ার ওপর কাটিয়ে দিল।

ভোরের আলো ফুটলো পাহাড়ের চূড়ায়, এখানে ওখানে। ফৌজি একটি পাথরে হেলান দিয়ে এক লোককে বসে থাকতে দেখলো। তার কাপড়ে রক্তের দাগ, মাথা একদিকে হেলে পড়ে আছে। ফৌজি তার ভাবীকে বললো, 'ভাবী, দেখো! দেখো! সামনে এক আহতকে দেখা যাচ্ছে।'

'থাক, ওর দিকে নজর দেয়ার সময় নেই আমাদের।'

'লোকটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে তাও দেখবো না!'

'না, থামার সময় নেই ফৌজি! সবার আগে আমাদের তুর্কমান পৌঁছতে হবে।'

রাস্তার পাশেই বসেছিল লোকটি। দেখতে দেখতে ওরা তার কাছে চলে এলো। অচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠলো লোকটি। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে চাইল সেদিকে। ওদের এগিয়ে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

ঘোড়া একদম কাছে চলে এসেছিল, লোকটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো ফৌজি, 'ভাইয়া!!!'

তারা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। কিন্তু ফৌজির চিৎকার শুনতে পেলো না সে, তার আগেই উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল হারেস।

হারেস লড়াইয়ের সময় প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে শহীদ হয়ে যায়নি। তার বেঁচে থাকাটা এক অলৌকিক ব্যাপার। শরীরে বর্শার অসংখ্য আঘাত খেয়ে পড়ে যাওয়ার পরই সে অজ্ঞান হয়ে হয়ে যায়। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল সে জানে না। যখন চেতনা পেল, পাশের এ পাথরের গায়ে এসে হেলান দিয়ে বসেছিল।

ফৌজির ঘোড়ার সাথে পানির ছোট মশক ছিল। ফৌজি তাড়াতাড়ি মশক এনে হারেসের চোখেমুখে পানির ছিটা দিল। হারেস অস্ফুটকণ্ঠে বললো, 'পানি! পানি!'

ওরা ওর মুখে পানি ঢেলে দিল, পানি পান করে হারেস চোখ খুললো। নিজের বোন ও বেগমকে তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি এখন কোথায়?

বাড়ীতে? দাউদ কোথায়?'
ফৌজি তাকে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বললো। সব শুনে হারেস বললো, 'তোমরা আমাকে জলদি ঘোড়ায় উঠাও। তাড়াতাড়ি করো, আমাকে তুর্কমানের দিকে নিয়ে চলো!'
অসীম সাহসী দুই নারী অনেক কষ্টে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। ফৌজি বসলো ভাইয়ের পিছনে। হারেস শুধু তার অসম্ভব আত্মশক্তি বলে বেঁচে ছিল নতুনা তার শরীরে রক্ত বলে কিছুই ছিল না। একটা ফরজ সমাধা করার জন্যই যেন আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।
ফৌজি তাকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছিল, যেন সে ঘোড়া থেকে পড়ে না যায়। হারেস অস্ফুটস্বরে ফৌজিকে রাস্তা বলে দিচ্ছিল।

সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তিনটি বাহিনী সাইফুদ্দিনের কমাণ্ডে তুর্কমানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অন্যদিকে ফৌজি, হারেস ও হারেসের স্ত্রী এক নিরাপদ পথ ধরে ছুটছিল তুর্কমানের দিকে।
ভোরের সূর্য বেশ উপরে উঠে এলো। আকাশের দিগন্তে ক্রমশ বাদামী আভা ছড়িয়ে পড়ছিল।
দিগন্তের বাদামী আভা ক্রমশ উপরে উঠতে লাগলো। ক্রমে সে আভা গাঢ় হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করছিল। দেখতে দেখতে রোদের তেজ ঢেকে দিল উড়ন্ত ধূলিমেঘ। ফৌজির ভাবী ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'ফৌজি, ওদিকে তাকাও!'
হারেস অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ফৌজি?'
'ধূলি ঝড়!' ফৌজি বললো ভীত কম্পিত কণ্ঠে।

এই পাহাড় ও মরুভূমির লোকেরা ধূলিঝড় কি জিনিস খুব ভাল করেই জানে। ধূলিঝড়কে ওরা বলে খোদার অভিশাপ। যে অঞ্চল দিয়ে এ ধূলিঝড় বয়ে যায়, সে অঞ্চলটি মুহূর্তে পরিণত হয়ে যায় ধ্বংসস্তূপে। সম্পদের বিনাশ আর অগণিত প্রাণের আর্ত আহাজারীতে মুখর হয়ে উঠে সাজানো লোকালয়। মানুষ ও পশুদের জন্য এ ঝড় নিয়ে আসে কিয়ামতের প্রলয়।

ধূলিঝড় মরুভূমির বালিকে উড়িয়ে নিয়ে প্রবল শক্তিতে একদিকে ছুটে যেতে থাকে। সেই বালির নিচে উপত্যকা, লোকালয় যা কিছুই পড়ে, সবকিছু ঢেকে যায় অন্ধকারে। বালির পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে মানুষ, পশু, ঘরবাড়ী, সবকিছু।

ফৌজি, তার ভাবী ও হারেস তাকিয়েছিল এই ভয়ংকর ঝড়ের দিকে। চোখেমুখে শংকা ও ভয়ের কাঁপন। দেখতে দেখতে চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল।

আল মালেকুস সালেহ, গুমাস্তগীন ও সাইফুদ্দিনের সম্মিলিত বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর ওপর অতর্কিত আক্রমণের জন্য তুর্কমানের কাছাকাছি এসে এক পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়ে তখন বিশ্রাম করছিল। আজ সারাদিন এখানে অবস্থান করে রাতে আইয়ুবীর বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা তাদের। সারা রাত ওরা নির্ঘুম পথ চলেছে। পথ চলেছে আগামী রাতটির জন্য। আজ রাতেই আইয়ুবীর ওপর অতর্কিতে এমন আক্রমণ চালানো হবে, যেন দুনিয়া থেকে মুছে যায় আইয়ুবীর নাম।

তাবু ফেলার পরপরই সৈন্যরা তড়িঘড়ি নাস্তা সেরে শুয়ে পড়লো। দুই রাতের ঘুম একসাথে সেরে নিচ্ছিল ওরা।

পাহাড়ের কোলে ছায়ার মধ্যে তাবু টানিয়ে ঘুমিয়ে আছে সম্মিলিত বাহিনী। ভয়ংকর মরু সাইমুম ছুটে আসছে ওদের নাস্তানাবুদ করতে, তাবুর ভেতর শুয়ে এ কথা কেউ জানতেও পারল না। যারা ছাউনি পাহারায় ছিল, ঘুমে ঢুলছিল ওরাও, তাই ওদের চোখেও প্রথমে ধরা পড়েনি সেই মরুঝড়।

ওদিকে আইয়ুবীর ক্যাম্পে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী প্রশিক্ষণরত সৈনিকদের সামনে তখন বক্তৃতা করছিলেন। তিনি ওদের বলছিলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য পাগলপারা মুজাহিদ বাহিনী! আল্লাহ তোমাদের বাহুর শক্তি আরো বাড়িয়ে দিন! তোমাদের হিম্মত ও কুওত বৃদ্ধি করে দিন। তোমাদের তলোয়ারে হযরত আলী (রা.)-এর তেজ ও চমক দান করুন। তোমাদের তীরের গতি হোক চোখ ধাঁধানো। ঘোড়াগুলো হোক দুলদুল অশ্বের মত গতিশীল ও তেজস্বী! আমাদের দুশমন কখনো হারানের গুমাস্তগীন, মুশেলের সাইফুদ্দিন বা হলবের আমীর আল মালেকুস সালেহ নয়। দুশমন আমাদের ক্রুসেডাররা! আগ্রাসী খৃস্টানরা! যারা আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে আমাদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা। ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করেছে আমাদের ভাইদের। অপবিত্র করেছে আমাদের একমাত্র বাতিঘর পবিত্র কোরআন। লুণ্ঠন করেছে আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম। মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

ফিলিস্তিনের পবিত্র মাটি থেকে নাপাক শক্তিকে উচ্ছেদ করতে হবে। আমাদের ভাইদের কান্না, বোনদের আহাজারী ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকছে আমাদের। মনে রেখো, এখন আমাদের টার্গেট ফিলিস্তিন! এখানে যথেষ্ট সময় আমরা পেয়েছি প্রস্তুতির। এই প্রস্তুতিকে সম্বল করে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে এবার টার্গেটের দিকে কদম বাড়াতে হবে আমাদের। যদি আমাদের লাশ আল্লাহর মঞ্জুর হয়, তবে সে লাশ যেন পড়ে ফিলিস্তিনের মাটিতে, আর যদি আল্লাহর মঞ্জুর হয় আমাদের বিজয়, তবে মসজিদুল আকসায় শোকরানা নামায পড়ার আগে আমরা কোথাও থামবো না। আমাদের গতি হবে ঝড়ের মত উদ্দাম! টার্গেটে পৌঁছার আগে এ ঝড় কোথাও থামবে না, এ শপথ ও সংকল্পে দৃঢ় করো সবার চিত্ত। মনের ভেতর গেঁথে নাও একটি মাত্র শব্দ, ফিলিস্তিন! ফিলিস্তিন!
আইয়ুবীর কণ্ঠ থেমে গেল। মরুভূমির বাতাসে, ইথারে ইথারে ভাসতে লাগল আইয়ুবীর সেই কণ্ঠধ্বনিঃ বন্ধুরা আমার! ভাইয়েরা আমার! এখন আমাদের টার্গেট ফিলিস্তিন! ফিলিস্তি.....

পরবর্তী বই ক্রুসেড – ১৭

গাদ্দার

ক্রুসেড-১৬

টার্গেট ফিলিস্তিন

আসাদ বিন হাফিজ